একক ৯৭ □ ব্রিটিশ সংবিধানের বিবর্তন ও প্রধান নীতিসমূহ

গঠন

৯৭.১ উদ্দেশ্য

৯৭.২ প্রস্তাবনা

৯৭.৩ ব্রিটিশ সংবিধান

৯৭.৩.১ ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

৯৭.৩.২ ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

৯৭.৩.৩ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

৯৭.৩.৪ আইনের অনুশাসন

৯৭.৪ সারাংশ

৯৭.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

৯৭.৬ উত্তরমালা

৯৭.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৯৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন—

- ব্রিটেনে যে শাসনতন্ত্র প্রচলিত আছে কিভাবে তা বর্তমান রূপ নিয়েছে।
- সম্পূর্ণভাবে লিখিত না হলেও সেই দেশের শাসনতন্ত্র কিভাবে কার্যকর হয়েছে।
- গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের এক প্রতিশ্রুতি আইনের অনুশাসনের অর্থ কি এবং
- সংসদীয় গণতন্ত্রের পীঠস্থান হিসেবে এখনও ব্রিটিশ শাসনপদ্ধতির প্রভাব কেন সক্রিয়।

৯৭.২ প্রস্তাবনা

ব্রিটিশ সংবিধান হল বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান। এই সংবিধান কোন সাংবিধানিক পরিষদ দ্বারা ঘোষিত হয় নি। দীর্ঘদিন ধরে বিবর্তনের মাধ্যমে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। এই এককে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করব এবং কেন ব্রিটিশ সংবিধান আজও স্বাতন্ত্র্য দাবী করে তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব।

৯৭.৩ ব্রিটিশ সংবিধান

যে কোনও প্রতিষ্ঠানকে যথাযথভাবে পরিচালনা করতে হলে কতকগুলি নিয়মকানুনের প্রয়োজন। এই নিয়মকানুন না থাকলে কোন প্রতিষ্ঠানই তার কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারে না। প্রতিষ্ঠান মানুষই গড়ে বিভিন্ন উদ্দেশ্যসাধনের জন্য। কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলি যথাযথভাবে পরিচালিত হয় তখনই যখন সেই অনুযায়ী বিধিবিধান প্রস্তুত হয়ে থাকে। এই বিধিবিধান অনুসরণ করেই দায়িত্বপ্রাপ্ত সংগঠন কর্তৃপক্ষ প্রতিষ্ঠানটির কাজ সংগঠিত করে, প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত নেয়, সদস্যদের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে দেয়, প্রতিষ্ঠানকে সর্বাঙ্গীন সাফল্যের দিকে এগিয়ে নিয়ে যায়, পরস্পর বিরোধী স্বার্থের মধ্যে সমন্বয় সাধন করে, প্রতিষ্ঠানের নিয়মভঙ্গ করলে শাস্তি প্রদানের পদ্ধতি স্থির করে দেয় এবং প্রয়োজনে সংগঠনকে যে কোনরকম আক্রমণ থেকে বাঁচায়।

রাষ্ট্র মানুষের তৈরী একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাষ্ট্রের আয়তন বড়, সদস্যসংখ্যা অনেক এবং সমস্যাও প্রচুর। তাই প্রত্যেক রাষ্ট্রেই নানাবিধ কার্যাবলী সম্পাদনের জন্য একটি সরকার গঠিত হয়। সরকারই রাষ্ট্রের পরিচালন সমিতি। সরকারের মূল কাজ তিন ধরনের ঃ আইন প্রণয়ন, আইন প্রয়োগ এবং আইনের ব্যাখ্যা। একটি সরকারের অস্তিত্ব, তার কার্যাবলী ও তার ক্ষমতা বণ্টন যে নীতিনিয়মের দ্বারা নির্ধারিত হয় তাই হল সংবিধান। বস্তুতঃ রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একান্তভাবে প্রয়োজনীয় এই সমস্ত নিয়মকানুনের সমষ্টিকেই সাধারণভাবে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলা হয়।

কোনও দেশের সংবিধান অনেকাংশে নির্ভর করে সেই দেশের ইতিহাস, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থসামাজিক কাঠামো, ধর্মীয় বিশ্বাস ও জনসংখ্যার প্রকৃতির ওপরে। তবে যেহেতু সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য হল নাগরিক অধিকার রক্ষা করা এবং সরকারের ক্ষমতাকে সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া, সেহেতু সেই পরিপ্রেক্ষিতটিই সংবিধান গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা মনে রাখতে হবে। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে ঃ সংকীর্ণ অর্থে ও ব্যাপক অর্থে। ব্যাপক অর্থে শাসনতন্ত্র হ'ল দেশ শাসনের জন্য সমস্ত লিখিত ও অলিখিত নিয়মকানুন। সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের লিখিত মৌলিক আইনকানুন—যার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের সংবিধান চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা - সম্পন্ন এবং তা বিশেষ সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়।

কিন্তু এই অর্থে ব্রিটেনে কোনও সংবিধান বা শাসনতন্ত্রের অস্তিত্ব নেই। কারণ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মৌলিক আইনকানুন কোনও একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোনও সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়নি।

মুনরো এবং এয়ার্স্ট (Munro and Ayerst) উল্লেখ করেছেন, ব্রিটিশ সংবিধান কোনও একটি উৎস

থেকে উদ্ভূত হয় নি। কোন গণপরিষদ অথবা সাংবিধানিক সম্মেলনের মাধ্যমে তা গৃহীত হয় নি। ব্রিটিশ সংবিধানের নিরবচ্ছিন্নতা প্রায় অদৃশ্য বিকাশের ফল। এই সংবিধান এমন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যেখানে সনদ, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, রীতি ও ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়েছে।

অনুশীলনী — ১

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ** (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটিশ সংবিধান একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধান একটি গণপরিষদের মাধ্যমে গৃহীত হয়েছিল।

(গ) রাষ্ট্র মানুষের তৈরী একটি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান।

২। সংবিধান দুটি অর্থে ব্যবহৃত হ'তে পারে। সেগুলি কি কি? (পাঁচ বা ছয়টি বাক্যে উত্তর দেবেন)

৯৭.৩.১ ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস

গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস হল সনদ, (Charter) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, (Statute) প্রথাগত আইন, (Common Law), সাংবিধানিক রীতিনীতি, (conventions of the constitution) বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত (Judicial Interpretations and Decisions) আইন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত (Important works on constitutional law and commentaries of the specialists) ।

(ক) **সনদ ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে ইংল্যাণ্ডের রাজন্যবর্গ বিভিন্ন রকম সনদকে স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন। ঐতিহাসিক দলিলরূপে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ১২১৫ সালের মহাসনদ, ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন, ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল প্রভৃতি। এই সনদগুলিকে আমরা ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি।

(খ) **পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ঃ** ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য এবং সেই সঙ্গে রাজার ক্ষমতা সঙ্কোচনের উদ্দেশ্যে, জনগণের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আইন প্রণয়ন করেছে। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত এইসব বিধিবদ্ধ আইন ব্রিটিশ সংবিধানের দ্বিতীয় উৎস হিসেবে চিহ্নিত হ'তে পারে। এইসব বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৬৭৯, ১৮১৬ এবং ১৮৬২ সালে প্রণীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত 'হেবিয়াস কর্পাস' আইন, ১৯১১ ও ১৯৪১ সালের 'পার্লামেন্ট আইন' এবং ১৯৭২ সালে প্রণীত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন আইন।

(গ) **বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যা ও সিদ্ধান্ত ঃ** বিচার বিভাগের সিদ্ধান্ত ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম

উৎসরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত। আদালত প্রথাগত আইন ও পার্লামেন্ট প্রণীত আইন ব্যাখ্যা করে। আদালতের অনেক রায় সাংবিধানিক দিক দিয়ে গুরুত্ব অর্জন করেছে। আদালতের রায় ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারের অন্যতম প্রধান উৎসে পরিণত হয়েছে।

(ঘ) **প্রথাগত আইন ঃ** দীর্ঘকাল ধরে প্রচলিত প্রথা রাষ্ট্র-কর্তৃত্ব এবং বিশেষভাবে আদালত কর্তৃক স্বীকৃতি অর্জন করলেই তা আইনের মর্যাদা অর্জন করতে পারে। তবে এই প্রথাগত আইনসমূহ যেমন আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয় না, তেমনি অর্ডিন্যান্স-এর মাধ্যমেও এগুলি ঘোষিত হয় না। তবু এই প্রথাগত আইন ব্রিটেনে ব্যক্তি-স্বাধীনতার রক্ষক ও ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পুরান আমলের Common Law Court গুলিতে এই প্রথাগত আইন দীর্ঘকাল অনুসৃত হয়ে এসেছে। রাজা দ্বিতীয় হেনরীর আমলে এগুলিকে সুসংহত রূপ দেওয়ার চেষ্টা হয়।

(ঙ) **সাংবিধানিক রীতিনীতি ঃ** সাংবিধানিক রীতিনীতি বলতে আমরা সেই সমস্ত নিয়মকানুনকে বুঝি যেগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হ'লেও তারা আইনের থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। শাসনকার্যে নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিকেই এগুলি মান্য করতে হয়। বস্তুতঃ গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের প্রধান ভিত্তি হ'ল সাংবিধানিক রীতিনীতি। রাজা বা রাণীর ক্ষমতা, ক্যাবিনেটের সঙ্গে সংসদের সম্পর্ক, দলীয় পরিষদের ঊর্ধ্বে স্পীকারের অবস্থান ইত্যাদি সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। দীর্ঘকালের বিবর্তনের মাধ্যমে ঐ সব রীতিনীতি গড়ে উঠেছে। ঐসব রীতিনীতির অনুধাবন ব্যতীত গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের পূর্ণাঙ্গ পরিচয় পাওয়া যায় না।

(চ) **বিশেষজ্ঞদের অভিমত ও গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী ঃ** প্রখ্যাত আইনজ্ঞ ও লেখকদের রচনাবলীও গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম উৎস। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য হ'ল অ্যানসনের Law and Customs of the Constitution, মে-র Parliamentary Practice, জেনিংস-এর Law and the Constitution ইত্যাদি।

অনুশীলনী — ২

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ** (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে সাংবিধানিক রীতিনীতি মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয়।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস মোটামুটি ছয়টি।

(গ) ১৬২৮ সালের অধিকারের আবেদন একটি পার্লামেন্ট প্রণীত আইন।

২। **বিধিবদ্ধ আইন বলতে কি বোঝায়? (তিনটি/চারটি বাক্যে উত্তর দিন)।**

৯৭.৩.২ ব্রিটিশ সংবিধানের প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য

প্রত্যেক সংবিধানেরই কয়েকটি নিজস্ব চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকে। ঐ বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণের

মাধ্যমেই সংবিধানটির মৌলিকতা ও বিশিষ্টতা সম্পর্কে আমরা ধারণা করতে পারি। ব্রিটিশ সংবিধানকে বিশ্লেষণ করলে আমরা নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি পাই।

(১) **অলিখিত সংবিধান :** ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত। সনদ, বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, প্রথাগত আইন, সাংবিধানিক রীতিনীতি ইত্যাদির সমন্বয়ে এই সংবিধান গড়ে উঠেছে। এই সংবিধান কোনও গণপরিষদ, কোনও সাংবিধানিক সম্মেলন অথবা আইনসভা কর্তৃক প্রণীত হয় নি। কোনও একটিমাত্র স্থায়ী এবং বিধিবদ্ধ দলিলরূপে এই সংবিধানকে চিহ্নিত করা যায় না।

(২) **ধারাবাহিকতা ও পরিবর্তনশীলতা :** গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের আর একটি বৈশিষ্ট্য হ'ল ধারাবাহিকতা এবং পরিবর্তনশীলতা। এই সংবিধান একটি গতিশীল সংবিধান। অতএব নিরন্তর পরিবর্তনশীল। কিন্তু এই সংবিধান কখনও পুরনো প্রশাসনিক কাঠামোকে ভেঙে ফেলে নতুন প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলে নি। ইংরেজ জাতি প্রকৃতিগতভাবে রক্ষণশীল। ফলে তারা ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখার পক্ষপাতী। যেমন তারা রাজতন্ত্রের বিলোপসাধন করে নি। কিন্তু গণতান্ত্রিক কাঠামোর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তার ক্ষমতা হ্রাস করেছে।

(৩) **সুপরিবর্তনশীল :** সুপরিবর্তনীয়তা ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এই সংবিধানের পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। সংসদে সাধারণ আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই ব্রিটিশ সংবিধানকে পরিবর্তিত করা যায়।

(৪) **নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র :** নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ব্রিটেনের সংবিধানের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনে রাজা বা রানী অসীম ক্ষমতার অধিকারী হলেও এবং রাজা বা রানীর নামে শাসনকার্য পরিচালিত হলেও তিনি দেশের নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধান। প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রি পরিষদ। রাজা বা রানী রাজত্ব করেন, দেশ শাসন করেন না।

(৫) **এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র :** ব্রিটেন হল এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এখানে রাষ্ট্রের যাবতীয় ক্ষমতা একটি মাত্র কেন্দ্রীয় সরকারে হাতে ন্যস্ত। এখানে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন সংস্থা থাকলেও তারা সরাসরি কেন্দ্রীয় সরকারের দ্বারা ন্যস্ত ক্ষমতাই ভোগ করতে পারে।

(৬) **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের অনুপস্থিতি :** গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নেই। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে আইন-বিভাগ ও শাসনবিভাগ পরস্পরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। আবার লর্ডসভা পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হ'লেও এই কক্ষের বিচার-বিভাগীয় ক্ষমতাও আছে।

(৭) **পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা :** পার্লামেন্টের সার্বভৌমিকতা বলতে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের চূড়ান্ত ক্ষমতাকেই বোঝায়। আইনগত সার্বভৌমিতার অধিকারী হিসেবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে কোন আইন সংশোধন করতে পারে, যে কোন আইন বাতিল

করতে পারে। ব্রিটেনের কোন আদালতই পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে না। তবে পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা অবাধ নয়।

(৮) **আইনের অনুশাসন ঃ** ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হ'ল আইনের প্রাধান্য, সামাজিক অবস্থান নির্বিশেষে আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। আইনের অনুশাসনের জন্যই ব্রিটেনের নাগরিকগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারেন বলে মনে করা হয়।

(৯) **সংসদীয় শাসনব্যবস্থা ঃ** ব্রিটেনকে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মাতৃভূমি বলা হয়। ১২৯৫ সালে রাজা প্রথম এডওয়ার্ড Model Parliament আহ্বান করেন। প্রায় চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই বলা যায় সংসদীয় শাসনের সূত্রপাত। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার সমস্ত বৈশিষ্ট্যই ব্রিটেনে বর্তমান। যেমন নিয়মতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের উপস্থিতি, পার্লামেন্টের কাছে মন্ত্রি পরিষদের দায়িত্বশীলতা, শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির অনুপস্থিতি ইত্যাদি।

(১০) **ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব ঃ** ব্রিটেনে তত্ত্বগতভাবে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠিত হ'লেও দ্বিদলব্যবস্থা ও সংখ্যা গরিষ্ঠের শাসনের ফলে কার্যত এখানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তবে বর্তমানে ক্যাবিনেটের এই একনায়কত্ব প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্বেরই অন্য নাম।

(১১) **প্রধানমন্ত্রীর প্রাধান্য ঃ** বিগত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত দ্রুত বেড়ে গিয়েছে যে তাঁকেই সরকারের একক পরিচালক হিসেবে গণ্য করা যায়। অভ্যন্তরীণ প্রশাসনের ক্রমবর্ধমান ব্যাপ্তি ও জটিলতা এর একটি কারণ। সেই সংগে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দেশের প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা ক্রমেই বেশী পরিমাণে মান্যতা প্রাপ্ত হচ্ছে।

(১২) **দুর্বল বিচারব্যবস্থা ঃ** ব্রিটেনে বিচার-বিভাগের ক্ষমতা খুব সীমিত। এখানে বিচার-বিভাগ পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইন ব্যাখ্যা করতে পারে। কিন্তু ঐ আইনের বৈধতা সম্পর্কে কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না।

(১৩) **সাংবিধানিক রীতিনীতি ঃ** ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলির মূল্য অপরিসীম। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এই রীতিনীতিগুলি মেনে চলেন এবং এই রীতিনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

(১৪) **অগণতান্ত্রিক উপাদান ঃ** ব্রিটেনে গণতান্ত্রিক কাঠামো প্রতিষ্ঠিত হলেও কিছু কিছু অগণতান্ত্রিক উপাদান এখনও বর্তমান। যেমন রাজতন্ত্র এবং উত্তরাধিকার সূত্রে গঠিত লর্ডসভা।

(১৫) **দ্বিদলীয় ব্যবস্থার অস্তিত্ব ঃ** ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান। কার্যত অনেকগুলি

রাজনৈতিক দল থাকলেও দুটি মাত্র দল—রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল এখানে প্রাধান্য লাভ করেছে। দুটি দলের মতাদর্শ পৃথক বলে এই ব্যবস্থাকে 'সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা' বলা হয়। শাসনের অধিকার চক্রবৎ দুই দলের মধ্যেই আবর্তিত হতে থাকে।

(১৬) **নাগরিক অধিকার ঃ** অন্যান্য উদারনৈতিক গণতন্ত্রের মত ব্রিটেনেও নাগরিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। যেমন আইনের চোখে সমানাধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, ভোটদান ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও হস্তান্তর করার অধিকার ইত্যাদি। তবে সমালোচকদের মতে এখানে শোষণের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অধিকার না থাকায় অন্যান্য অধিকারগুলি অনেকাংশে গৌণ হয়ে পড়েছে।

অনুশীলনী — ৩

১। **সঠিক উত্তর ☑ দিন ঃ**

(ক) ব্রিটিশ সংবিধান (লিখিত/অলিখিত)।

(খ) ব্রিটিশ সংবিধান (সুপরিবর্তনীয়/দুষ্পরিবর্তনীয়)।

(গ) ব্রিটেন একটি (এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র/যুক্তরাষ্ট্র)।

(ঘ) ব্রিটেন প্রচলিত রাজতন্ত্র (নিয়মতান্ত্রিক/চরম)।

(ঙ) ব্রিটেন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ (আছে/নেই)।

(চ) ব্রিটেন (দ্বিদলীয়/বহুদলীয়) ব্যবস্থা প্রচলিত।

৯৭.৩.৩ শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার অন্যতম প্রধান উৎস হল সাংবিধানিক রীতিনীতি। এই রীতিনীতিগুলি হ'ল শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত সেই নিয়মকানুন যেগুলি আইনের অংশ না হ'লেও শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়। এই রীতিনীতিগুলির পিছনে আইন বা আদালতের কোন সমর্থনমূলক আদেশ না থাকলেও শাসনব্যবস্থায় নিযুক্ত প্রতিটি ব্যক্তিই এই রীতিনীতিগুলি বাধ্যতামূলকভাবে মেনে চলেন।

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করতে পারি। যেমন (ক) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে প্রচলিত প্রথার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে; (খ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়। (গ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অমান্য করলে ব্যক্তিকে কোন শাস্তি পেতে হয় না। (ঘ) অথচ প্রতিষ্ঠিত সাংবিধানিক রীতিনীতির বিরোধী কোনো সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগ সহজে কার্যকর হতে পারে না।

এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলিকে লর্ড অ্যানসন 'সংবিধানের প্রথা' নামে উল্লেখ করেছেন জন

স্টুয়ার্ট মিল তাদের 'সংবিধানের অলিখিত বিধান' নামে অভিহিত করেছেন। ডাইসি ঐ নিয়মগুলিকে 'সাংবিধানিক রীতিনীতি' নামে বর্ণনা করেছেন। স্যর আইভর জেনিংস বলেন যে এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আইনের শুষ্ক দেহকে রক্ত-মাংসে জীবন্ত করে তোলে। ওয়েড এবং ফিলিপস্ বলেন সাংবিধানিক রীতিনীতি হ'ল প্রথা এবং প্রয়োজনীয়তার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা নিয়মাবলীর সমষ্টি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে তাদের উৎস হল মানুষের সুস্পষ্ট মতৈক্য। অন্যভাবে বলা যায়, এই রীতিনীতিগুলি সে দেশের বিবর্তনশীল রাজনৈতিক সংস্কৃতির (political culture) প্রতিফলন।

৯৭.৩.৩ আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতি

আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বর্তমান।

(১) আইন নির্দিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা দ্বারা প্রণীত হয়, কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি কোনও সংস্থা কর্তৃক প্রণীত হয় না।

(২) আইন আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য নয়।

(৩) আইন লিখিত, সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

(৪) আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হ'লে, আইনের প্রধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়।

(৫) আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক; সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়। অথচ এর বিরুদ্ধাচারণ অতি বিরল ঘটনা।

(৬) আইন লিখিতভাবে পেশ করা যায়। সাংবিধানিক রীতিনীতি লিখিতভাবে পেশ করা যায় না।

(৭) ডাইসির মতে, সাংবিধানিক রীতিনীতি সকল সময় একইভাবে প্রয়োগ হয় না। স্থানকালভেদে এর তারতম্য হতে পারে। কিন্তু আইন সর্বত্র একইভাবে প্রয়োগ করা হয়।

(৮) প্রয়োজন অনুযায়ী আইন প্রণয়ন করা সম্ভব। কিন্তু সুবিধা অনুযায়ী হঠাৎ সাংবিধানিক রীতিনীতি গড়ে তোলা যায় না।

(৯) নির্ধারিত মঞ্চে জনমত যাচাই, দলীয় স্তরে আলাপ আলোচনা ও সংসদে বিচার বিবেচনার পর আইন তৈরী করা হয়। পক্ষান্তরে সাংবিধানিক রীতিনীতি ধীরে ধীরে গড়ে ওঠে নিয়ত ব্যবহারের মাধ্যমে।

(১০) আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুসরণ করতে হয়। সাংবিধানিক রীতিনীতি কোনও নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি অনুসরণ করে গড়ে ওঠে না।

৯৭.৩.৩ সাংবিধানিক রীতিনীতির শ্রেণী বিভাজন

গ্রেট ব্রিটেনের সাংবিধানিক রীতিনীতিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন ঃ

(১) রাজশক্তির ক্ষমতা সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ এই ধরনের রীতিনীতিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজা বা রানী কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হবেন; পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজা বা রানী স্বাক্ষর করতে বাধ্য।

(২) ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ এই শ্রেণীর শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ ক্যাবিনেট বা মন্ত্রিসভা কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকবে; প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিসভার সদস্যদের পার্লামেন্টের যে কোনও কক্ষের সদস্য হতে হবে ; পার্লামেন্টে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হবে।

(৩) পার্লামেন্ট সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ এই শ্রেণীর সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বছরে অন্ততঃ একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করতে হবে ; কমন্সসভার অধ্যক্ষ বা স্পীকার দল নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করবেন। একমাত্র পার্লামেন্টই সরকারের আয়ব্যয় অনুমোদনের ক্ষমতা রাখে।

(৪) কমনওয়েলথ সম্পর্কিত রীতিনীতি ঃ কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনের সম্পর্কও সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়। যেমন কোনও ডোমিনিয়নের অনুরোধ ক্রমেই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেই ডোমিনিয়নের জন্য আইন প্রণয়ন করবে, অন্যথায় নয়। যেমন, কানাডা বা অস্ট্রেলিয়ায় রাষ্ট্রপ্রধান পদে ব্রিটিশ রাজা বা রানীর এখন বিকল্প ব্যবস্থা চালু হয়েছে ঐসব দেশেরই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী।

৯৭.৩.৩ সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি মান্য করার কারণ

সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি ভঙ্গ করলে শাস্তির কোন ভয় নেই। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্যও নয়। তাই স্বাভাবিক কারণেই প্রশ্ন ওঠে যে সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি মান্য করা হয় কেন?

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রতি আনুগত্যের কারণ হিসেবে অনেকে ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল মানসিকতা ও ঐতিহ্যপ্রিয়তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

সাংধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত ও প্রথাগত হওয়ায় ব্রিটেনে একটি সুপরিবর্তনীয় শাসন কাঠামো গড়ে তুলেছে। এই সুপরিবর্তনীয়তার প্রতি জনগণের পূর্ণ সমর্থন আছে।

দীর্ঘদিন ধরে প্রচলিত এই রীতিনীতিগুলি শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য রক্ষা করে। রীতিনীতি লঙ্ঘিত হ'লে শাসনব্যবস্থার ভারসাম্য বিনষ্ট হবে। যেমন বৎসরে অন্ততঃ একবার পার্লামেন্টের অধিবেশন না হলে সরকারের আয়ব্যয় অনুমোদনই লাভ করবে না।

অগ্ (০৯৯)-এর মতে সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করার প্রধান কারণ হ'ল জনমতের চাপ। এই রীতিনীতিগুলির প্রতি গ্রেট ব্রিটেনের জনগণের অভ্যস্ত আনুগত্য সরকারকে রীতিনীতি মানতে বাধ্য করে।

সাংবিধানিক রীতিনীতির ক্ষেত্রে আর একটি শক্তিশালী যুক্তি হল এই যে রীতিনীতি লঙ্ঘিত হলে লঙ্ঘিত নীতিকে আইনে রূপান্তরের দাবি শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে।

পরিশেষে বলা যায় যে সাংবিধানিক রীতিনীতির বাস্তব উপযোগিতার কারণেও এগুলিকে মান্য করা হয়। এই রীতিনীতিগুলি মান্য করার মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনে গণসার্বভৌমিকতার ধারণা বাস্তবে রূপায়িত করা সম্ভব হয়েছে।

৯৭.৩.৩ সাংবিধানিক রীতিনীতির গুরুত্ব

বর্তমানে জটিল জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে সব রাষ্ট্রই একটি লিখিত সংবিধানের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। তা ছাড়া লিখিত সংবিধান ব্যতীত দেশের শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কোন স্পষ্ট ধারণা গড়ে উঠতে পারে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা এখনও পর্যন্ত মূলত রীতিনীতি নির্ভর। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে হতে পারে যে ব্রিটেনে এই সাংবিধানিক রীতিনীতির অপরিহার্যতার পশ্চাতে এমন অনেক কারণ আছে যা তাদের ভূমিকাকে এত গুরুত্বপূর্ণ করে তুলেছে।

(১) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি আইনের কাঠামোকে গতিশীল করে সম্পূর্ণতা দান করে।

(২) এই রীতিনীতিগুলি সংবিধানকে যুগোপযোগী করে তোলে।

(৩) গ্রেট ব্রিটেনের বিদ্যমান শাসনতান্ত্রিক তত্ত্ব অনুসারে সংবিধানের কার্যপদ্ধতি যেন সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখাও রীতিনীতির উদ্দেশ্য।

(৪) রীতিনীতিগুলি সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণ করে।

(৫) সাংবিধানিক রীতিনীতি সংবিধানের নমনীয়তা বজায় রাখে ও তার সীমাবদ্ধতা দূর করে।

(৬) সাংবিধানিক রীতিনীতির মাধ্যমে পুরণো আইন নতুন পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখে।

(৭) সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করতে এই রীতিনীতিগুলি কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

(৮) আইন ও বাস্তব প্রয়োজনের মধ্যেকার ফাঁকটুকু পূরণ করে এই রীতিনীতিগুলি।

(৯) জনগণের ইচ্ছা ও সরকারী কর্তৃত্বের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করে এই সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি।

অনুশীলনী — ৪

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ** (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ব্রিটেনে সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলির পিছনে আদালতের সমর্থন আছে।

(খ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অমান্য করলে কোন শাস্তি পেতে হয় না।

(গ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি নির্দিষ্ট ও ক্ষমতাপ্রাপ্ত সংস্থা কর্তৃক প্রণীত।

(ঘ) সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি অলিখিত, অস্পষ্ট ও অনির্দিষ্ট।

২। আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে তিনটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

৩। সাংবিধানিক রীতিনীতি কয়প্রকার ও কি কি?

৪। সাংবিধানিক রীতিনীতিগুলি কেন মান্য করে চলা হয়?

৯৭.৩.৪ আইনের অনুশাসন

গৌরবময় বিপ্লবের (১৬৮৮ খৃঃ) পর থেকেই আইনের অনুশাসনের ধারণা ধীরে ধীরে ইংল্যাণ্ডে প্রসারলাভ করে। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাণ্ডে পুঁজিবাদ শক্তিশালী ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। তার প্রভাব রাজনৈতিক ব্যবস্থা এবং চিন্তার ক্ষেত্রেও ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হয়। এইসময় আইনের অনুশাসনের ধারণা উদারপন্থী গণতান্ত্রিক চিন্তাবিদদের বক্তব্যের মাধ্যমে জনপ্রিয়তা ও গুরুত্বলাভ করে।

সহজ সরল ভাষায় আইনের অনুশাসন বলতে বোঝায় আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য, আইনের চোখে সকলের সমানাধিকার, নির্দিষ্ট আইনভঙ্গের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগপ্রদান, প্রচলিত আইন অনুযায়ী অপরাধের বিচার প্রভৃতি। আইনের অনুশাসনের মূল কথা হ'ল সকলেই আইনের অধীন। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ডাইসি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Introduction to the Law of the Constitution ('শাসনতান্ত্রিক আইনের ভূমিকা')-য় আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেন। ডাইসির ব্যাখ্যা অনুসারে আইনের অনুশাসনের তত্ত্বটি তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেগুলি হল ঃ

প্রথমত, আইনের অনুশাসন সব রকম স্বৈরী ক্ষমতার বিরোধী। সরকারের কোন স্বৈরী ক্ষমতা থাকতে পারে না। এর অর্থ হ'ল আদালতের চোখে দোষী সাব্যস্ত না হওয়া পর্যন্ত কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া যাবে না অথবা তাকে জীবন ও সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা যাবে না। এর মাধ্যমে আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্যের কথা বলা হয়েছে। ব্রিটেনে আইনের সর্বব্যাপী প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাই বলা যায় ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অস্তিত্ব রয়েছে।

দ্বিতীয়ত, আইনের অনুশাসন অনুযায়ী কোন ব্যক্তিই আইনের উর্দ্ধে নয়। সকলেই আইনের চোখে সমান। ক্ষমতা, অবস্থা ও পদমর্যাদা নির্বিশেষে দেশের সমস্ত নাগরিকই দেশের সাধারণ আইনের অধীন। ডাইসি উল্লেখ করেছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ পুলিশ কর্মচারী ও সরকারী কর আদায়কারিগণ অন্যান্য নাগরিকের মতই আইন বিরোধী কার্যকলাপের জন্য সমভাবে দায়িত্বশীল।

ডাইসি আইনের অনুশাসন নীতির বিন্যাসের ক্ষেত্রে ফ্রান্সের প্রশাসনিক আইনের ধারণাকে গ্রহণ করেন নি। ফ্রান্সে প্রশাসনিক কর্মচারীদের বিচারের জন্য স্বতন্ত্র প্রশাসনিক আদালত ছিল। ডাইসির মতে, এই নীতির প্রয়োগ আইনের দৃষ্টিতে সাম্য প্রতিষ্ঠার পরিপন্থী।

তৃতীয়ত, ব্রিটেনে নাগরিকদের অধিকার সাধারণ আইন দ্বারা সংরক্ষিত হয়েছে। অন্যান্য দেশে যেভাবে সংবিধানের বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা নাগরিক অধিকার স্বীকৃত এবং সংরক্ষিত হয়, গ্রেট ব্রিটেনে সেইসব বিধিবদ্ধ আইন ব্যক্তি স্বাধীনতার উৎস নয়। পক্ষান্তরে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তই নাগরিক অধিকার সংরক্ষিত করে। বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে অধিকারের উৎসরূপে গণ্য করা হয়। বিচার-বিভাগ প্রধানত দেশের প্রথাগত আইন ও পূর্ববর্তী সিদ্ধান্ত অনুযায়ী অধিকার সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তি করে।

ইংল্যাণ্ডে আইনের অনুশাসনতত্ত্বের ব্যাপক প্রচার এবং প্রসারের মূলে আছে তার অর্থনৈতিক-সামাজিক কাঠামোর দ্রুত পরিবর্তন। সেই সময় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ থেকে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার জন্য প্রয়োজন ছিল সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন রাষ্ট্রের, যে রাষ্ট্র তাদের অধিকারের রক্ষকের ভূমিকা পালন করবে। তৎকালীন পুঁজিবাদী কাঠামোয় অর্থনৈতিক ভিত্তি সংরক্ষণের জন্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আইনের কাঠামো গড়ে তোলা অত্যাবশ্যক ছিল। ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্ব ঐ অর্থনৈতিক ভিত গড়ে তোলার একটি প্রয়াস। আইনের অনুশাসন, আইনের দৃষ্টিতে সমান অধিকার এবং আইনের দ্বারা সকলের সম-মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নীতি কার্যকর করতে চেয়েছে। তবে বাস্তবে এই সমানাধিকারের অর্থ হ'ল সম্পদশালীদের সমানাধিকার। কারণ সমাজে অর্থনৈতিক বৈষম্য থাকলে নিঃস্ব মানুষের জন্য আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয় না। N.P. মূল্যায়ন : ডাইসির আইনের অনুশাসনতত্ত্ব নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব। কিন্তু একথা স্বীকার করতেই হবে যে তাঁর এই ধারণা ঊনবিংশ শতকের ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার দ্বারা প্রভাবিত। স্যার আইভর জেনিংসের মতে ডাইসির তত্ত্বের সঙ্গে তাঁর একনিষ্ঠ উদ্যোগের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও তাঁর এই ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে ব্যক্তিকেন্দ্রিক ব্যাখ্যায় পরিণত হয়েছে এবং বর্তমানে নানাদিক দিয়ে সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে :-

(১) ডাইসির ব্যাখ্যায় সকলপ্রকার স্ববিবেচনামূলক (discretionary) ক্ষমতাকে অস্বীকার করা হয়েছে। কিন্তু বর্তমানকালের জটিল সমাজব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সরকারকে যেহেতু বিভিন্ন ধরনের কাজ সম্পাদন করতে হয়, সেহেতু সরকারের হাতে স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতা বা বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করা দরকার হয়ে পড়ে। এমন কি ডাইসির সময়েও অনেক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা (prerogatives) আইনের অন্তর্ভুক্ত ছিল। জেনিংস এর মতে সরকারী কর্তৃপক্ষ ব্যাপক স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা ভোগ করে। তিনি উল্লেখ করেছেন ইংল্যাণ্ডে প্রকৃত স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতা পার্লামেন্টের হাতে ন্যস্ত।

(২) ডাইসি আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয় উল্লেখ করেছেন। তত্ত্বগতভাবে এই নীতিটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু বাস্তবে এই নীতি কতটা প্রযোজ্য সেই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। বস্তুতঃ ডাইসি আইনের দৃষ্টিতে সমতার নীতি প্রতিষ্ঠার জন্য যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন, তাঁর নিজের দেশেই সেই নীতি সার্থকভাবে প্রযুক্ত হয় নি। আইনের দৃষ্টিতে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজন অর্থনৈতিক ও সামাজিক সাম্য ও ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। অর্থনৈতিক দিক থেকে অসম সমাজে কোনভাবেই আইনগত সমতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। অনেক সমালোচকের মতে, ডাইসি যে আইনগত সমতার বিষয় উল্লেখ করেছেন তা প্রকৃতপক্ষে দেশের বিত্তশালী অংশের স্বাধীনতা ও সমতা। দেশের সকল অংশের সমতা নয়।

(৩) ডাইসির আইনের অনুশাসন তত্ত্বের তৃতীয় নীতিটিতে বলা হয় যে সাংবিধানিক আইনের দ্বারা নয়, আদালতের সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই ব্রিটিশ নাগরিকদের অধিকারসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এই ধারণা পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ ইংল্যাণ্ডের নাগরিক অধিকারের বেশির ভাগই আদালতের সিদ্ধান্তের ফল নয়। উদাহরণস্বরূপ মহাসনদ, অধিকারের বিল, অধিকারের আবেদন, হেবিয়াস কর্পাস আইন প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যায়।

(৪) অনেকসময় বিনা বিচারে ও আদালতের রায় ছাড়াই রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সামাজিক স্বার্থের প্রয়োজনে রাষ্ট্র কোন ব্যক্তিকে আটক করতে পারে। ডাইসির নিজের দেশেই এই ধরনের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণীত হয়েছে। যেমন, ১৯১৪ সালের The Defence of the Realm Act, ১৯৩৯ সালের The Emergency Powers Act ইত্যাদি। এরই অনুসরণে ভারতের সংবিধানের ২২নং ধারা অনুযায়ী নিবর্তনমূলক আটক আইনের ব্যবস্থা আছে।

তবে উপরিউক্ত সমালোচনা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে আইনের অনুশাসন আইনগত সমানাধিকার রক্ষা এবং রাষ্ট্র কর্তৃত্বের স্বেচ্ছাচার প্রতিরোধে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করেছে।

পরিশেষে বলা যায় যে আইনের অনুশাসন কেবলমাত্র আইনগত সমানাধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকার এখানে স্থান পায় নি। ডাইসি এই তত্ত্বের মাধ্যমে ঊনবিংশ শতাব্দীর উদারনীতিবাদ প্রবর্তিত আইনগত সাম্যকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। কোনও পুঁজিবাদী সমাজের পক্ষেই অর্থনৈতিক সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়। ডাইসির দেশ গ্রেট ব্রিটেনেও তা সম্ভব হয় নি। আইনের অনুশাসন গণতান্ত্রিক দেশে স্বাভাবিক এবং বিশেষ পরিস্থিতিতে পদদলিত হয়েছে। তাই মার্কস্‌বাদীরা বলেন যে বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থায় আইন কখনও শ্রেণীস্বার্থের ঊর্দ্ধে উঠে সমদৃষ্টিসম্পন্ন হ'তে পারে না।

অনুশীলনী — ৫

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (✓ বা ✗ ব্যবহার করুন)**

(ক) আইনের অনুশাসনের প্রধান প্রবক্তা ডাইসি।

(খ) ব্রিটেনে বিচারবিভাগের সিদ্ধান্তকে নাগরিক অধিকারের উৎসরূপে গণ্য করা হয়।

(গ) আইনের অনুশাসন আইনগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমানাধিকারের কথা ঘোষণা করেছে।

২। ডাইসি কথিত 'আইনের অনুশাসন' যে তিনটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সেগুলির উল্লেখ করুন।

৯৭.৪ সারাংশ

সংবিধানের একটি সর্বজনগ্রাহ্য সংজ্ঞা নির্দেশ করা রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পক্ষে অদ্যবধি সম্ভব হয় নি। তাও এককথায় বলা যায় যে সুষ্ঠুভাবে রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় কতকগুলি মৌলিক নীতিকে সংবিধান বা শাসনতন্ত্র বলে।

ব্রিটিশ সংবিধান বিশ্বের প্রাচীনতম সংবিধান। কিন্তু ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মৌলিক আইনকানুন কোনও একটি দলিলে লিপিবদ্ধ আকারে পাওয়া যায় না। তাছাড়া কোন সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা এই সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয় নি। এই সংবিধান এমন একটা প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গড়ে উঠেছে যেখানে সনদ, পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, রীতি ও ঐতিহ্য এসে মিলিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সংবিধান একটি অলিখিত সুপরিবর্তনীয় সংবিধান। এখানে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা চাল্ থাকার দরুন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র উপস্থিত। পার্লামেন্ট তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম। কিন্তু বাস্তবে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব, সেখান থেকে প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীপরিষদ তাদের কাজের জন্য পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল।

ব্রিটিশ সংবিধানের অন্যতম প্রধান উৎস হল সাংবিধানিক রীতিনীতি। এই রীতিনীতিগুলি আদালত কর্তৃক বলবৎযোগ্য না হলেও শাসনকার্যে নিযুক্ত সমস্ত ব্যক্তি এই রীতিনীতিগুলি মেনে চলেন। এই রীতিনীতিগুলির ওপর ভিত্তি করে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো গড়ে উঠেছে।

ব্রিটিশ সংবিধানের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল আইনের অনুশাসন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইনের প্রাধান্য, আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের সাধারণ আইন দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। আইনের অনুশাসনের জন্যই ব্রিটিশ নাগরিকগণ অন্যান্য রাষ্ট্রের নাগরিকদের তুলনায় অনেক বেশী স্বাধীনতা ও অধিকার ভোগ করতে পারেন বলে মনে করা হয়।

৯৭.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎসগুলি কী কী?

২। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে কয়েকটি ঐতিহাসিক সনদের উল্লেখ করুন।

৩। ব্রিটেনের সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয় কেন?

৪। ব্রিটিশ সংবিধানকে সুপরিবর্তনীয় সংবিধান বলা হয় কেন?

৫। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস হিসেবে কয়েকটি প্রামাণ্য গ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

৬। ব্রিটেনে আইনের অনুশাসনের অর্থ কী? এর পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তিগুলি কী কী ?

৭। ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি কী স্বীকৃত?

৯৭.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

১। (ক)—☑, (খ)—☒, (গ)—☒

২। সংবিধান বা শাসনতন্ত্র শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে — ব্যাপক অর্থে ও সংকীর্ণ অর্থে। ব্যাপক অর্থে সংবিধান বলতে বোঝায় দেশের শাসনব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণকারী লিখিত ও অলিখিত সকলপ্রকার নিয়মকানুনকে। লিখিত নিয়মকানুন বলতে বোঝায় আইন এবং অলিখিত নিয়মকানুন বলতে বোঝায় প্রথা, প্রচলিত রীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি। সংকীর্ণ অর্থে সংবিধান হচ্ছে কোন একটি রাষ্ট্রের লিখিত মৌলিক আইন-কানুন যার দ্বারা রাষ্ট্রের গঠন, রাষ্ট্রের বিভিন্ন বিভাগের সংগঠন ও ক্ষমতা, রাষ্ট্রের সঙ্গে নাগরিকদের সম্পর্ক প্রভৃতি নির্ধারিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ধরনের সংবিধান চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতাসম্পন্ন এবং তা বিশেষ সংবিধান রচনাকারী পরিষদ দ্বারা রচিত ও গৃহীত হয়।

অনুশীলনী — ২

১। (ক)—☒, (খ)—☑, (গ)—☒

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ও রাজার ক্ষমতা সংকোচন ও জনগণের ভোটাধিকার সম্প্রসারণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ধরনের আইন প্রণয়ন করেছে। পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত এইসব আইনকেই বিধিবদ্ধ আইন হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এইসব বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ১৬৭৯, ১৮১৬ ও ১৮৬২ সালে প্রণীত ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সম্পর্কিত 'হেবিয়াস কর্পাস' আইন, ১৭০১ সালে প্রণীত 'সেট্‌লমেন্ট আইন', ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালে প্রণীত 'পার্লামেন্ট আইন' প্রভৃতি।

অনুশীলনী — ৩

(ক) লিখিত

(খ) সুপরিবর্তনীয়

(গ) এককেন্দ্রিক

(ঘ) নিয়মতান্ত্রিক

(ঙ) নেই

(চ) দ্বিদলীয়

অনুশীলনী — ৪

১। (ক)—☒, (খ)—☑, (গ)—☒, (ঘ)—☑

২। আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে কিছু মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান। যেমন —

(ক) আইন বলবৎযোগ্য, কিন্তু সাংবিধানিক রীতিনীতি বলবৎযোগ্য নয়।

(খ) আইন ও সাংবিধানিক রীতিনীতির মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হলে, আইনের প্রাধান্যই প্রতিষ্ঠিত হয়

(গ) আইন মান্য করা বাধ্যতামূলক। সাংবিধানিক রীতিনীতি মান্য করা বাধ্যতামূলক নয়।

৩। সাংবিধানিক রীতিনীতি চারপ্রকার — (ক) রাজশক্তির ক্ষমতা সম্পর্কিত, (খ) ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পর্কিত (গ) পার্লামেন্ট সম্পর্কিত এবং (ঘ) কমনওয়েলথ সম্পর্কিত।

৪। পাঠ্যাংশের ৯৭.৩.৩ গ-এর আলোচনা অনুসরণ করুন।

অনুশীলনী — ৫

১। (ক)—☑, (খ)—☑, (গ)—☒

২। পাঠ্যাংশের ৯৭.৩.৪-এ আলোচনা দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী ঃ

১। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধানের উৎস হল — (ক) সনদ, (খ) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন, (গ) বিচার-বিভাগীয় সিদ্ধান্ত, (ঘ) প্রথাগত আইন, (ঙ) সাংবিধানিক রীতিনীতি, (চ) আইন বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থাবলী এবং বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

২। ঐতিহাসিক সনদ বা চুক্তিপত্রের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—(ক) ১২১৫ সালের 'মহাসনদ' (খ) ১৬২৮ সালের 'অধিকারের আবেদনপত্র' (গ) ১৬৮৯ সালের 'অধিকারের বিল' এবং (ঘ) ১৭০১ সালের 'সেট্‌ল্‌মেন্ট' প্রভৃতি।

৩। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান কোন আইনসভা, গণপরিষদ অথবা সাংবিধানিক সম্মেলন কর্তৃক গৃহীত হয় নি। রাষ্ট্র পরিচালনার নিয়মাবলী, প্রধান প্রধান সরকারী প্রতিষ্ঠান এবং তাদের ক্ষমতা ও কার্যাবলী সংকলিত করে লিখিতভাবে উপস্থাপন করা হয় নি। এই সংবিধান কোন নির্দিষ্ট সময়ে রচিত হয় নি। সেইজন্য এই সংবিধানকে অলিখিত সংবিধান বলা হয়।

৪। ব্রিটিশ সংবিধান পরিবর্তনের জন্য কোন জটিল পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয় না। সাধারণ

আইন প্রণয়নের পদ্ধতিতেই এই সংবিধান পরিবর্তন করা যায়। তবে সমালোচকদের মতে তত্ত্বগত দিক থেকে ব্রিটিশ সংবিধান যতটা নমনীয় বাস্তবে ততটা নমনীয় নয়। কেননা কোন দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয় না দুষ্পপরিবর্তনীয় তা নির্ভর করে সমাজের প্রাধান্যকারী শ্রেণীর স্বার্থ সেই সংবিধান রক্ষা করতে পারছে কি না তার ওপর।

৫। ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের উৎস হিসেবে কয়েকটি প্রমাণ্য গ্রন্থ হল — (১) অ্যানসনের "Law and Customs of the Constitution, মে রচিত "Parliamentary Practice" এবং জেনিংস-এর "Law and the Constitution".

৬। ১৮৮৫ সালে অধ্যাপক ডাইসি তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'শাসনতান্ত্রিক আইনের ভূমিকা'-য় আইনের অনুশাসন তত্ত্বটি ব্যাখ্যা করেন। আইনের অনুশাসনের অর্থ হল আইনের সর্বাত্মক প্রাধান্য, আইনের চোখে সাম্য এবং দেশের সাধারণ আইনের দ্বারা নাগরিকদের অধিকারসমূহের সংরক্ষণ। ব্রিটেনের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও শাসনতন্ত্রের বিকাশের ক্ষেত্রে আইনের অনুশাসনের একটি ইতিবাচক ভূমিকা আছে।

৭। গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতাস্বতন্ত্রীকরণ নেই। যা আছে তা হল কাঠামোগত স্বতন্ত্রীকরণ। গ্রেট ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিবর্তে পারস্পরিক নির্ভরশীলতা ও সহযোগিতাই প্রাধান্য লাভ করেছে। এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগ ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। শাসনবিভাগের আইনগত প্রধান হলেন রানী। তিনি আবার পার্লামেন্টেরও অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। একমাত্র বিচারবিভাগের ক্ষেত্রেই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ প্রযোজ্য।

পক্ষে ও বিপক্ষে যুক্তির জন্য মূল্যায়ন অংশটি অনুসরণ করুন।

৮৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J. Harvey and L. Bather, MacMillan* — The British Constitution, St. Martin's Press, 1970.

২। *Sir Ivor Jennings*— Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959.

৩। *ডঃ অনাদি কুমার মহাপাত্র* — নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

৪। *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ* — তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। *সুদর্শন ভট্টাচার্য* — (প্রশ্নোত্তরে) তালনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ৯৮ □ শাসনবিভাগ

গঠন

৯৮.১ উদ্দেশ্য

৯৮.২ প্রস্তাবনা

৯৮.৩ রাজা এবং রাজশক্তি

৯৮.৩.১ রাজশক্তির ক্রমবিবর্তন

৯৮.৩.২ রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস

৯৮.৩.৩ রাজশক্তির ক্ষমতা

৯৮.৩.৪ রাজশক্তির ক্ষমতার মূল্যায়ন

৯৮.৩.৫ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণ

৯৮.৪ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট

৯৮.৪.১ প্রধানমন্ত্রী পদের উৎস

৯৮.৪.২ প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

৯৮.৪.৩ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

৯৮.৪.৪ প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদা

৯৮.৪.৫ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব

৯৮.৪.৬ ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীপরিষদ

৯৮.৪.৭ পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেট

৯৮.৪.৮ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

৯৮.৪.৯ ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী

৯৮.৫ সারাংশ

৯৮.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

৯৮.৭ উত্তরমালা

৯৮.৮ গ্রন্থপঞ্জী

৯৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন —

(১) ব্রিটিশ গণতন্ত্রে আজও রাজশক্তি কিভাবে টিকে আছে।

(২) ব্রিটিশ রাজনৈতিক ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা।

(৩) ব্রিটেনে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ।

৯৮.২ প্রস্তাবনা

গ্রেট ব্রিটেনে পার্লামেন্টিয় ব্যবস্থা বর্তমান। এই ব্যবস্থায় একজন নাম সর্বস্ব অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক থাকেন যিনি নামে শাসক কিন্তু প্রকৃত কোন ক্ষমতা ভোগ করেন না। তাঁর নামে শাসনকার্য পরিচালিত হয়। তিনি হলেন রাজা বা রানী।

ব্রিটেনে প্রকৃত ক্ষমতা ভোগ করেন প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদ। প্রধানমন্ত্রী হলেন ব্রিটেনের প্রশাসনিক কাঠামোয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীর প্রভাব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে বহু সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও লেখক গ্রেট ব্রিটেনের সরকারী ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থারূপে অভিহিত করেছেন।

প্রধানমন্ত্রীকে প্রশাসনিক কাজে সাহায্য করে তাঁর ক্যাবিনেট। এই ক্যাবিনেটই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির মস্তিষ্ক বিশেষ। তাকে কেন্দ্র করেই সমগ্র প্রশাসন আবর্তিত হয় এবং আইন বিভাগ ও শাসনবিভাগের সংযোগ রক্ষিত হয়।

৯৮.৩ রাজা ও রাজশক্তি

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজা ও রাজশক্তির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাই এই বিষয়টি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন।

৯০.৩.১ শক্তির ক্রমবিবর্তন

ব্রিটিশ রাজতন্ত্র বিশ্বের মধ্যে প্রাচীনতম প্রতিষ্ঠান যা আজও তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। দীর্ঘ কয়েক শতকের বিবর্তনের মধ্য দিয়ে রাজশক্তি আজ বর্তমান অবস্থায় উপনীত হয়েছে। ইতিমধ্যে ব্রিটেনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ফলে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছে। এর ফলে রাজশক্তির মধ্যেও এসেছে পরিবর্তন। এই রাজশক্তির বিকাশের মাধ্যমেই ঐ দেশের সাংবিধানিক কাঠামোর বৈচিত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রাজা এগবার্টের সময় থেকেই রাজশক্তির সূচনা।

একাদশ শতকে রাজা উইলিয়মের সময়ে ইংল্যাণ্ডে সামন্ততন্ত্রের অধ্যায় শুরু হয়। তিনি রাজনৈতিক ও ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রশ্নাতীত প্রাধান্য লাভ করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতকে সামন্ত ও যাজকশ্রেণীর সম্মিলিত প্রচেষ্টার ফলে রাজশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

ষোড়শ শতকে ইংল্যাণ্ডে টিউডর আমলে স্বৈরতান্ত্রিক ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। দেশের আভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা ও বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ, নতুন গড়ে ওঠা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্থায়িত্ব ও সম্ভাবনা সৃষ্টিতে সাফল্যলাভ করার ফলে টিউডর স্বৈরশাসন দীর্ঘদিন বজায় ছিল।

ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে ইংল্যাণ্ডের সামাজিক জীবনে বিপুল পরিবর্তন আসতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত প্রসার সামন্ততান্ত্রিক সমাজের ভিত্তিকে দুর্বল করে দিতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর সামাজিক-উত্থানের জন্য রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক উৎপত্তির ভিত্তি ও সামন্তদের প্রাধান্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। চরম রাজতন্ত্র ছিল সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থের প্রধান রক্ষক। এই চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন জানাবার জন্য ঐশ্বরিক উৎপত্তিবাদ প্রচারিত হয়েছিল যেখানে রাজাকে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিষ্ঠিত কবার চেষ্টা হয়েছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য রাজতন্ত্রের ঐশ্বরিক ভিত্তিকে ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নেতৃত্বেই রাজতন্ত্রের অবাধ কর্তৃত্ব ও সামন্তদের দাপটের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। তারই ফলশ্রুতি গৌরবময় বিপ্লব ১৬৮৮ সালে। এই বিপ্লবের ফলে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজশক্তির ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করে দেওয়া হয়। পার্লামেন্ট মূল ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং রাজতন্ত্র ক্রমে আলঙ্কারিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়।

উনবিংশ শতাব্দীতে রানী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে এই সীমাবদ্ধ রাজতন্ত্রও জনপ্রিয়তার চূড়ান্ত শিখরে পৌঁছেছিল। বর্তমান শতকেও রাজতন্ত্রের ভূমিকা অব্যাহত আছে। এর কারণ রাজশক্তি প্রচলিত সমাজব্যবস্থার সংরক্ষকের ভূমিকা পালন করে।

২.৩.২ রাজশক্তির ক্ষমতার উৎস

ব্রিটেনে রাজশক্তির ক্ষমতা বলতে একদিকে ব্যক্তি হিসেবে রাজা বা রানীর ক্ষমতাকে বোঝায়, অন্যদিকে প্রতিষ্ঠানরূপে রাজশক্তির ক্ষমতাকে বোঝায়। বর্তমানে রাজশক্তি বলতে প্রাতিষ্ঠানিক রাজাকেই বোঝায়। গণতন্ত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটেনে ব্যক্তিগত রাজার নিকট থেকে ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক রাজার নিকট হস্তান্তরিত হয়েছে।

অতএব আমরা বলতে পারি যে রাজা ব্রিটেনে প্রশাসনিক প্রধান যদিও বাস্তবে তিনি নামসর্বস্ব শাসক অথবা নিয়মতান্ত্রিক শাসক।

আমরা জানি যে ব্রিটেনের সংবিধান অলিখিত সংবিধান এবং মুখ্যতঃ তা শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। স্বভাবতঃই ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতা কোন সংবিধানে বর্ণিত হয় নি। রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস হ'ল : (১) রাজকীয় বিশেষাধিকার (Royal Prerogatives) এবং (২) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন (Statute)।

(১) **রাজকীয় বিশেষাধিকার ঃ** একসময় রাজা ছিলেন প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী কিন্তু গৌরবময় বিপ্লবের পর রাজশক্তির ক্ষমতা হ্রাস করা হয় এবং পার্লামেন্টকেও তার ক্ষমতা ধীরে ধীরে হস্তান্তরিত করতে হয় পার্লামেন্টের নিকট দায়িত্বশীল এক ক্যাবিনেটের ওপর। এর পরেও তাঁর পূর্বতন স্ববিবেচনামূলক ক্ষমতার মধ্যে যা অবশিষ্ট আছে তাকেই রাজকীয় বিশেষাধিকার বলা হয়। বস্তুতঃ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই রাজকীয় বিশেষাধিকার বলতে সার্বভৌম রাজশক্তির সেই সকল ক্ষমতাকে বোঝানো হয় যা তিনি বিধিবদ্ধ আইনের পরিবর্তে প্রথাগত আইনের মাধ্যমে অর্জন করেছেন। বর্তমানে রাজকীয় বিশেষাধিকারকে অবশিষ্ট (Residue) ক্ষমতারূপে বিবেচনা করার কারণ হ'ল পার্লামেন্ট আইন প্রণয়ন করে এই ক্ষমতা গ্রহণ করতে পারে। পার্লামেন্ট আইনের মাধ্যমে কোনও কোনও বিশেষাধিকারকে অধিগ্রহণ করেছে। আবার কোনও কোনও বিশেষাধিকার দীর্ঘকাল প্রয়োগ না করার ফলে বিলুপ্ত হয়ে গেছে।

বাস্তবে আমরা দেখতে পাই যে আইনগতভাবে বিশেষাধিকার রাজার হাতে ন্যস্ত। তবে এটি একটি নিছক ধারণামাত্র। রাজশক্তি এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন না। তাছাড়া এই ক্ষমতার প্রয়োগ আদালতের এক্তিয়ার বহির্ভূত। আদালত এই ক্ষমতার প্রয়োগে কাউকে বাধ্য করতে পারে না এবং এই ক্ষমতা লঙ্ঘিত হ'লে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি দিতে পারেন না।

কয়েকটি রাজকীয় বিশেষাধিকার ঃ

(১) রাজা/রানী সকল ন্যায়নীতির উৎস। (The King/Queen is the Fountain of Justic.)

(২) রাজা/রানী সকল রাষ্ট্রীয় সম্মানের উৎস। (The King/Queen is the fountain of state Honour.)

(৩) রাজা/রানী সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। (The King/Queen is the Head of the Armed Force.)

(৪) রাজার মৃত্যু নেই। (The King never die.)। এক রাজা বা এক রানীর মৃত্যু হ'লেও সিংহাসন শূন্য থাকে না। রাজতন্ত্র অব্যাহত থাকে।

(৫) পার্লামেন্ট বিষয়ক রাজকীয় বিশেষাধিকার (Prerogatives relating to Parliament)। রাজা/রানী পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান, সমাপ্তি ঘোষণা এবং মুলতুবী রাখার ক্ষমতা ভোগ করেন। রাজা/রানীর সম্মতি ব্যতীত পার্লামেন্ট প্রণীত কোন বিল আইনে পরিণত হয় না।

পরিশেষ বলা যায় যে বিশেষাধিকার বলতে রাজশক্তির মধ্যযুগীয় ক্ষমতার সেই অবশিষ্ট অংশকে বোঝায়, যা প্রথাগত আইন এবং পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের মাধ্যমে সংশোধন ও প্রত্যাহার করা হয় নি।

ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতার দ্বিতীয় উৎস হল বিধিবদ্ধ বা পার্লামেন্টপ্রণীত আইন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট বিধিবদ্ধভাবে রাজাকে কতকগুলি ক্ষমতা দিয়েছে।

অনুশীলনী — ১

১। ব্রিটিশ রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস কী?

২। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর বিশেষাধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতির দুটি উদাহরণ দিন।

৩। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর বিশেষাধিকার বলতে কী বোঝায়?

৯৮.৩.৩ রাজশক্তির ক্ষমতা

ক্ষমতার প্রকৃতি অনুযায়ী রাজশক্তির ক্ষমতাকে শাসনসংক্রান্ত, আইনসংক্রান্ত, বিচারসংক্রান্ত এবং অন্যান্য ক্ষমতা---এইভাবে ভাগ করা যায়।

শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা—তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনে শাসন-সংক্রান্ত সমস্ত ক্ষমতা রাজা বা রানীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। এখানে ক্ষমতার মূল কেন্দ্রবিন্দু হ'লেন রাজা বা রানী। শাসন সংক্রান্ত সব ক্ষমতাই রাজা বা রানীর নামে প্রয়োগ করা হয়। শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(ক) যাতে আইন অনুযায়ী শাসনকার্য পরিচালিত হয়, তা দেখা এবং তাকে সুনিশ্চিত করা।

(খ) প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করা এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করা; শাসনবিভাগের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং বিচারকদের নিয়োগ করা; স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর প্রধানদের নিয়োগ করা।

(গ) এইসব কর্মচারীদের অপসারণ করা;

(ঘ) স্থল, নৌ, বিমানবাহিনীর সর্বাধিনায়ক হিসাবে সামরিক বিভাগকে নির্দেশ দেওয়া;

(ঙ) রাষ্ট্রদূত ও অন্যান্য কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের নিয়োগ ও অপসারণের ক্ষমতা রাজার হাতে ন্যস্ত। বৈদেশিক কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের পরিচয়পত্রও তিনি গ্রহণ করেন।

(চ) আন্তর্জাতিক সন্ধি ও চুক্তি সম্পাদন করা।

(ছ) যুদ্ধঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করা।

(জ) ডমিনিয়ান ও উপনিবেশগুলির শাসনকার্য পরিচালনা করা। রাজা ডমিনিয়ানসমূহের ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের গভর্ণর জেনারেল নিয়োগ করেন।

আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ ব্রিটেনে রাজা বা রানী পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। ব্রিটেনে পার্লামেন্ট বলতে রাজাসহ পার্লামেন্টকে বোঝায়। কারণ ব্রিটেনের রাজা বা রানী এবং লর্ডসভা ও কমন্সসভাকে নিয়েই ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত।

ব্রিটেনে পার্লামেন্ট গঠনে রাজার ভূমিকা নেই। কিন্তু আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে রাজা এখনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানীর আইনসংক্রান্ত ক্ষমতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল ঃ

(ক) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতাবলে রাজা বা রানী পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন, স্থগিত রাখেন এবং প্রয়োজনে পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন।

(খ) পার্লামেন্টের পাশ হওয়া বিল রাজা বা রানীর সম্মতিলাভ করলে আইনে পরিণত হয়।

(গ) ব্রিটেনের রাজা পার্লামেন্টের উদ্বোধনী ভাষণ দেন। প্রধানমন্ত্রী এই ভাষণ রচনা করেন।

(ঘ) রাজশক্তির কিছু আদেশ জারির ক্ষমতাও আছে। এই আদেশ জারির মাধ্যমে নির্দিষ্ট শাসন বিভাগীয় দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়। এই আদেশকে সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) বলা হয়।

(ঙ) রাজা বা রানী অনেকসময় পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করেন। তবে রাজা বা রানী তাঁদের আইনসংক্রান্ত সব ক্ষমতাই মন্ত্রীসভার পরামর্শ অনুযায়ী প্রয়োগ করে থাকেন। বস্তুতঃ আইন সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজার ক্ষমতা নিতান্তই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ক্ষমতার অনুরূপ।

(চ) রাজা বা রানীর পূর্বসম্মতি নিয়ে কমন্সসভায় অর্থ বিল ও বার্ষিক বাজেট পেশ করা হয়।

বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ রাজা বা রানীকে ব্রিটেনের সকল ন্যায়বিচারের উৎস হিসেবে গণ্য করা হয়। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানী তাঁর বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তাঁর বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

(ক) রাজা বা রানী বিচারপতিদের নিয়োগ করেন;

(খ) পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের যৌথ আবেদনের ভিত্তিতে তিনি বিচারপতিদের পদচ্যুত করতে পারেন।

(গ) রাজা বা রানীর নামে সকল প্রকার বিচার পরিচালিত হয় এবং রাজার নামে অপরাধীদের দণ্ড দেওয়া হয়।

(ঘ) রাজা বা রানী বিচারালয়ে দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস বা মকুব করতে পারেন।

(ঙ) কমনওয়েলথ ভুক্ত কয়েকটি স্বাধীন রাষ্ট্র এবং উপনিবেশগুলির বিচারালয় থেকে আসা আপিল বিচারের ক্ষেত্রে তিনি বিচারকার্য সম্পাদন করেন।

অন্যান্য ক্ষমতা ঃ

(ক) ব্রিটেনের রাজা বা রানী ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের চার্চের প্রধান। এই দায়িত্বে থেকেই তিনি প্রধান যাজক ও অন্যান্য যাজকদের নিযুক্ত করেন। চার্চের বিভিন্ন বিধি ও আইনসমূহ রাজার অনুমতিসাপেক্ষ। তবে চার্চ সংক্রান্ত কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে প্রিভি কাউন্সিলের

বিচারবিভাগীয় কমিটির মাধ্যমে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি হয়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে রাজা বা রানীর সঙ্গে ক্যাথলিক চার্চের কোন সম্পর্ক নেই।

(খ) ব্রিটেনের রাজা বা রানীর হাতে সম্মানকজনক উপাধি বন্টনের ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয়েছে। সেই জন্য রাজা বা রানীকে সকল সম্মানের উৎস বলা হয়। ব্রিটেনে নববর্ষ, রাজ্যাভিষেক অথবা রাজা/রানীর জন্মদিন উপলক্ষে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সম্মানসূচক উপাধি ও পদবী বন্টন করা হয়।

ব্রিটেনের রাজা বা রানী ইংল্যাণ্ডের এবং স্কটল্যাণ্ডের চার্চের প্রধান। চার্চের বিধি ও আইনসমূহ রাজার অনুমতি সাপেক্ষ।

ব্রিটেনের রাজা বা রানী কমনওয়েলথ-এর প্রধান। তাঁর মাধ্যমেই ব্রিটেনের সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলির সংযোগ রক্ষিত হয়েছে।

অনুশীলনী — ২

১। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক কে?

২। ব্রিটেনে রাজা কোন্ ব্যক্তিকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন?

৩। সপরিষদ রাজাজ্ঞা (Orders-in-Council) কাকে বলে?

৪। ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের যে কোনও একটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতার উল্লেখ করুন।

৯৮.৩.৪ রাজশক্তির ক্ষমতার মূল্যায়ন

ব্রিটেনের রাজশক্তির পদমর্যাদাকে কেন্দ্র করে দুটি পরস্পরবিরোধী মতের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। প্রথম মতের সমর্থকরা রাজা বা রানীকে ব্রিটেনের প্রকৃত শাসক বলে চিহ্নিত করে তাঁর বিপুল ক্ষমতার উল্লেখ করেন। ওয়ালটার বেজহট-এর মতে এখনও রানীর পরামর্শদান, সতর্ক করার এবং উৎসাহদানের ক্ষমতা আছে। তিনি প্রয়োজনবোধে তাঁর দীর্ঘকালের সঞ্চিত অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রীসভাকে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ দিতে পারেন। প্রধানমন্ত্রীকে স্বমতে আনয়নে বাধ্য করতে পারেন। মন্ত্রীসভা কর্তৃক রাষ্ট্রস্বার্থবিরোধী কোন নীতি গৃহীত হ'লে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করতে পারেন। গঠনমূলক কাজেও রাজা বা রানী মন্ত্রীসভাকে উৎসাহিত করতে পারেন। বার্কারও রাজশক্তিকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার 'ক্রিয়াশীল' অংশরূপে চিহ্নিত করতে চান। রাজশক্তির গুরুত্ব আলোচনা প্রসঙ্গে গ্ল্যাডস্টোন উল্লেখ করেছেন যে ইংল্যাণ্ডে রাজা জাতীয় ঐক্যের প্রতীক এবং সামাজিক কাঠামোর শীর্ষে অবস্থিত। তিনি আইন-প্রণেতা, চার্চের প্রধান, ন্যায়বিচার এবং সকল সম্মানের একমাত্র উৎস। তিনি মন্ত্রীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত, আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদন, যুদ্ধ ঘোষণা ও শান্তিস্থাপন করেন। তিনি সার্বভৌম পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন ও কমন্সসভা ভেঙ্গে দিতে পারেন।

কিন্তু দ্বিতীয় মতের সমর্থকরা উপরোক্ত বক্তব্যের বিরোধিতা করে এই অভিমত পোষণ করেন যে

তত্ত্বগতভাবে ব্রিটেনের রাজা বা রানী ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হ'লেও বাস্তবে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রাজা বা রানী পার্লামেন্টের কাছে দায়িত্বশীল মন্ত্রী পরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। তিনি রাজত্ব করলেও শাসন করেন না। বস্তুতঃ রাজা বা রানী ক্ষমতাহীন আনুষ্ঠানিকতার প্রতীকে পরিণত হয়েছেন। এক কথায় কোন ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রেই রাজা বা রানীর ব্যক্তিগত ভূমিকার কোন মূল্য নেই।

কিন্তু সঠিক অবস্থা যথার্থ পর্যালোচনা করলে রাজা বা রানীর পদমর্যাদা সম্পর্কে উপরোক্ত দুটি অভিমতের কোনও একটিকে এককভাবে সমর্থন করা যায় না। দু'ধরনের বক্তব্যের মধ্যেই কিছুটা সত্যতা নিহিত আছে। কারণ বর্তমানের গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানী অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করতে বাধ্য থাকলেও তাঁর রাজনৈতিক ভূমিকাকে এখনকার দিনে সম্পূর্ণ উপেক্ষাও করা যায় না। যেমন, কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকে রাজা বা রানী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ করেন এবং প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শমত অন্যান্য মন্ত্রীদের নিয়োগ করেন। কিন্তু কমন্সসভার নির্বাচনে কোনও দল যদি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পায় সেক্ষেত্রে রাজা বা রানী নিজস্ব বিবেচনা অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ করতে পারেন।

অতএব আমরা বলতে পারি যে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ মত চলার ক্ষেত্রে রাজা বা রানীর বাধ্যবাধকতা থাকলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তিনি নিজের বিচার বিবেচনা অনুযায়ী কাজ করতে পারেন। অবশ্য সবকিছুই নির্ভর করে রাজা বা রানীর দক্ষতা, যোগ্যতা ও বুদ্ধি বিবেচনার ওপর।

স্যার আইভর জেনিংস রাজার চারটি গুরুত্বপূর্ণ কার্যাবলীর বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে (১) রাজা বা রানীর প্রভাব সংবিধানের সকল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করতে সাহায্য করে। (২) তাঁর প্রভাব কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে। (৩) তিনি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগ করেন এবং (৪) রাজনৈতিক এলাকার বাইরে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ভূমিকা পালন করেন।

৯৮.৩.৫ ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় রাজতন্ত্রের স্থায়িত্বের কারণ

(১) **সাংবিধানিক সুবিধা ঃ** রাজা বা রানী বর্তমানে সাংবিধানিক প্রধানের ভূমিকাই পালন করেন। তাই রাজশক্তি অব্যাহত রাখার ক্ষেত্রে কোন সমস্যার সৃষ্টি হয় না। আইভর জেনিংস-এর মতে রাজা বা রানীই শাসনতন্ত্রকে ধরে রেখেছেন।

(২) **রাজপদের ব্যবহারিক মূল্য ঃ** ব্রিটেনের সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় রাজপদের ব্যবহারিক মূল্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। রাষ্ট্রীয় নীতি ও দেশের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভার পরামর্শদাতা হিসেবে রাজা বা রানীর পরামর্শের যথেষ্ট গুরুত্ব আছে।

(৩) **রাজা বা রানী নিরাপত্তার আশ্রয়স্থল ঃ** যুদ্ধ, জাতীয় সংকট অথবা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে দিশেহারা মানুষ রাজা বা রানীকেই নিরাপত্তার প্রতীক বলে মনে করেন। জনগণের এই মানসিকতাই ব্রিটিশ রাজতন্ত্রকে যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে বাঁচিয়ে রেখেছে।

(৪) **দলীয় রাজনীতির উর্ধ্বে অবস্থান ঃ** রাজা বা রানী কোন বিশেষ দল বা গোষ্ঠীর নেতা নন, তিনি আপামর জনসাধারণের রাজা। জনগণের এই অনুভূতিই ইংল্যাণ্ডের রাজা বা রানীকে জাতীয় ঐক্যের প্রতীকে পরিণত করেছে।

(৫) **সামাজিক ও রাজনৈতিক ভারসাম্য ঃ** আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর স্থায়িত্ব রক্ষা করে রাজশক্তি এবং সেই সঙ্গে জাতিকে বৈপ্লবিক অস্থিরতা থেকে দূরে সরিয়ে রাখে।

(৬) **সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য হ'ল নিয়মতান্ত্রিক শাসকের উপস্থিতি। ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় রাজা বা রানী এই নিয়মতান্ত্রিক শাসকের ভূমিকা পালন করেন। রাজা বা রানীর বিকল্প কোনও পদ এখনও সৃষ্টি করা সম্ভব হয় নি।

(৭) **রাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ ঃ** ব্রিটিশ রাজতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার পথে কখনও বাধা হয়ে দাঁড়ায় নি বরং গণতন্ত্রের সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্য বিধান করে নিয়েছে। এই গণতন্ত্রীকরণের জন্যই ব্রিটেনে রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

(৮) **রাজশক্তি ব্যয়বহুল নয় ঃ** অনেক বিশেষজ্ঞের মতে মার্কিন অথবা ফরাসী রাষ্ট্রপতির জন্য সরকার কোষাগার থেকে প্রত্যেক বছর যে ব্যয় নির্বাহ হয়, ব্রিটেনে রাজা বা রানীর তুলনায় সেই ব্যয় অনেক বেশী। কিন্তু রাজশক্তির সপক্ষে প্রদত্ত এই আর্থিক যুক্তি অনেকসময় গ্রাহ্য হয় না, যে কারণে বর্তমানে চেষ্টা চলছে রাজকীয় ব্যয়ের বহর একটা নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে রাখার।

(৯) **ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা ঃ** ব্রিটেনের জনসাধারণের চিন্তাধারা ও রক্ষণশীলতাও রাজশক্তি বজায় থাকার জন্য দায়ী। ঐতিহ্যের প্রতীক এই প্রতিষ্ঠানটির প্রতি এখনও মানুষের আকর্ষণ রয়েছে।

(১০) **অপরিহার্যতা ঃ** ওয়াল্টার বেজহটের মতে রাজা বা রানীর অস্তিত্ব ছাড়া ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থা শুধু ব্যর্থই হত না, বিলুপ্তও হ'ত।

(১১) **ধারাবাহিকতা রক্ষা ঃ** আর্নেস্ট বার্কারের মতে ব্রিটেনে রাজশক্তি নিরবচ্ছিন্নতা ও ধারাবাহিকতা রক্ষায় অনুপ্রেরণা দেয়। কার্যরত অবস্থায় কোন প্রধানমন্ত্রীর মৃত্যু হ'লে বা কোন প্রধানমন্ত্রী পদত্যাগ করলে অন্য কোন মন্ত্রীসভা কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাজা বা রানীর হাতেই শাসনকার্য পরিচালনার দায়িত্ব থাকে।

(১২) **কমনওয়েলথ্‌ভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগসূত্র ঃ** রাজা বা রানী ছাড়া কমনওয়েলথের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব হতো কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

(১৩) **অভিজ্ঞতার যুক্তি ঃ** আজীবন রাজপদে অধিষ্ঠিত থাকেন বলেই রাজা বা রানীর পক্ষে রাজনৈতিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা সম্ভব। এই সুযোগ কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর নেই।

উপসংহার ঃ বর্তমানে গণতান্ত্রিক রীতিনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নিয়মতান্ত্রিক প্রধান হিসাবে রাজা বা রানীর ভূমিকার সমালোচনা করে সমালোচকগণ নিম্নলিখিত যুক্তিগুলি প্রদর্শন করেন।

(১) রাজা বা রানী কখনও সম্পূর্ণভাবে রাজনীতি নিরপেক্ষ হ'তে পারেন না।

(২) রাজপদ যেহেতু বংশানুক্রমিক প্রতিষ্ঠান সেহেতু সেটি একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান।

(৩) রাজতন্ত্র অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

(৪) রাজা বা রানী সমাজের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার হাতিয়ার হিসেবেই তাঁদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন।

(৫) মার্কস্‌বাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করে একথা বলা যায় যে সামন্ততান্ত্রিক যুগে রাজা বা রানী সামন্তশ্রেণীর প্রতিনিধি হিসেবে কাজ করেছেন। বর্তমান ধনতান্ত্রিক যুগেও সেই রাজা বা রানী পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে তাদের স্বার্থ রক্ষা করে চলেছেন। সেই জন্যই ব্রিটেনের পুঁজিপতি শ্রেণী রাজা বা রানীকে তাদের শ্রেণীস্বার্থ বিরোধী বলে তো মনে করেই না বরং রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রেখে নিজেদের স্বার্থেই তাকে ব্যবহার করতে চায়। তাই বলা যায় যে ব্রিটেনের শাসক সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষার সহায়ক বলেই রাজতন্ত্র আজও টিকে আছে।

৯৮.৪ প্রধানমন্ত্রী ও ক্যাবিনেট

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দু হ'ল ক্যাবিনেট। প্রধানমন্ত্রী হ'লেন সেই ক্যাবিনেট তোরণের কেন্দ্রপ্রস্তর। তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারী কাজকর্ম আবর্তিত হয়।

৯৮.৪.১ প্রধানমন্ত্রী পদের উৎস

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী পদের সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ও ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে হলেও বর্তমানে প্রধানমন্ত্রীই হ'লেন ব্রিটেনের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব। ১৮৭৮ সালের বার্লিন চুক্তিতে সর্বপ্রথম 'প্রধানমন্ত্রী' এই নামটি উল্লিখিত হয়। আজকের দিনে প্রধানমন্ত্রীকে কেন্দ্র করেই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। কোন কোন সংবিধান বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনের সরকারি ব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা বলে উল্লেখ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ব্রিটিশ আইন-এ প্রধানমন্ত্রী পদের কোন আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি ছিল না। ১৯৩৭ সালে 'রাজকীয় মন্ত্রী আইন'-এ প্রধানমন্ত্রীর পদটিকে প্রথম আইনগত স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। তবে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও পদমর্যাদা নির্ধারিত হয়েছে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা। প্রকৃতপক্ষে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়েছে। সেই সঙ্গে তাঁর মর্যাদাও বেড়েছে।

৯৮.৪.২ প্রধানমন্ত্রীর নিয়োগ

সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানী প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন। যখন কোন একটি দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকে, তখন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগের ক্ষেত্রে কোন সমস্যাই দেখা দেয় না। কিন্তু কোন দলের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলেই সমস্যা দেখা দেয়। তখন প্রচলিত রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হ'লে স্ববিবেচনা প্রয়োগের কোন সুযোগ ও সম্ভাবনা থাকে না।

৯৮.৪.৩ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কার্যাবলী

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুখ্যতঃ সাংবিধানিক রীতিনীতি ও প্রথাগত আইনই প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতার উৎস। বিভিন্ন সময় পার্লামেন্ট প্রণীত আইনের দ্বারাও তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলী কিছু পরিমাণে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী আইনগত দিক থেকে না হ'লেও কার্যগত দিক থেকে ব্রিটেনের রাষ্ট্র প্রশাসনের সর্বোচ্চ পদাধিকারী। তিনিই হলেন সিদ্ধান্তগ্রহণ, নীতি প্রণয়ন ও প্রয়োগের মূল উৎস। রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সমস্ত বিষয়ের চূড়ান্ত দায়িত্ব তিনিই বহন করেন।

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে মোটামুটিভাবে নিম্নলিখিত কয়েকটি দিক থেকে আলোচনা করা যায় ঃ

(১) **কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** নির্বাচনের পর কমন্সসভায় যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতা বা নেত্রীকেই রাজা বা রানী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন। অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা এবং এই দলীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপরই তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্ব নির্ভরশীল। সুদীর্ঘ পাঁচ বছর ধরে যাতে তাঁর এই সংখ্যাগরিষ্ঠতা বজায় থাকে সেদিকে প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হয়। নতুবা কমন্সসভার আস্থা হারালে তাঁকে প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে পদত্যাগ করতে হয়। কমন্সসভার ভিতরে ও বাইরে দলীয় সদস্যদের ঐক্যবদ্ধ রাখার প্রধান দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর ওপর ন্যস্ত। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা হিসাবে প্রধানমন্ত্রীকে বিরোধী দলের মতামত ও সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধার মনোভাব পোষণ করতে হয়।

(২) **মন্ত্রিসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** প্রধানমন্ত্রীকে বলা হয় ক্যাবিনেট তোরণের কেন্দ্র প্রস্তর। তিনি হ'লেন মন্ত্রীপরিষদের নেতা। প্রধানমন্ত্রীকে নিযুক্ত করার পর রাজা বা রানী মন্ত্রীপরিষদ গঠনের ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন। প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা বা রানী মন্ত্রীদের মধ্যে দপ্তর বন্টন করেন। মন্ত্রিসভার গঠন থেকে শুরু করে পুনর্গঠন বা সমাপ্তিকাল পর্যন্ত এর সাফল্য ও ব্যর্থতা সব কিছুই নির্ভর করে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্বের ওপর। মন্ত্রীপরিষদ ও ক্যাবিনেটের ঐক্য ও সংহতি মূলতঃ প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বেই রক্ষিত হয়। সুতরাং মন্ত্রীপরিষদের নেতা হিসেবে তিনি কতটা

যোগ্যতা ও দক্ষতা সহকারে মন্ত্রীসভা ও ক্যাবিনেটকে তাঁর সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য করেন তার ওপরেই নির্ভর করে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের সাফল্য।

(৩) **কমন্সসভার নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী ঃ** প্রধানমন্ত্রী হলেন কমন্সসভার নেতা। কমন্সসভার দৈনন্দিন কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজন মন্ত্রী থাকেন বটে, কিন্তু কমন্সসভার কাজকর্ম তাঁরই নিয়ন্ত্রণাধীন। মন্ত্রিসভার নেতা হিসেবে তিনি মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্ত কমন্সসভার অভ্যন্তরে উপস্থাপিত করেন এবং তার সমর্থনে ব্যাখ্যা পেশ করেন। কমন্সসভার অভ্যন্তরে বিতর্কের উত্তর দিতে গিয়ে কোনও মন্ত্রী অসুবিধায় পড়লে প্রধানমন্ত্রী তাঁকে উত্তর দিতে সাহায্য করেন এবং তাঁর সমর্থনে এগিয়ে আসতে পারেন। কমন্সসভায় বিরোধী দলের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখাও প্রধানমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সুতরাং কমন্সসভার নেতা হিসেবে তিনি কতটা দক্ষতা ও যোগ্যতা সহকারে তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন মূলত তার ওপরই নির্ভর করে তাঁর প্রধানমন্ত্রীত্বের সাফল্য।

(৪) **প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানীর প্রধান পরামর্শদাতা ঃ** প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানীর ব্যক্তিগত পরামর্শদাতা। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রানী রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি এবং বিচারপতিদের নিয়োগ করেন। তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী রানী পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান ও সমাপ্তি ঘোষণা করেন। কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী রানী কমন্সসভা ভেঙে দিতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী এককভাবে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন না। ক্যাবিনেটের গৃহীত সিদ্ধান্তের ভিত্তিতেই তিনি কমন্সসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য রানীকে পরামর্শ দেন। বস্তুতঃ মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী রানীকে পরামর্শ দেন।

(৫) **প্রধানমন্ত্রী পররাষ্ট্রনীতির রূপকার ঃ** প্রধানমন্ত্রী হলেন দেশের পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য রূপকার। পররাষ্ট্র দপ্তরের জন্য স্বতন্ত্র মন্ত্রী থাকলেও দেশের অভ্যন্তরে ও বিদেশে পররাষ্ট্রনীতির মুখ্য প্রবক্তারূপে তিনি পরিচিত। আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে তাঁর বক্তব্যকেই সরকারী বক্তব্য হিসেবে গ্রহণ করা হয়। তাঁর বিদেশ ভ্রমণ কূটনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বলাভ করে। যুদ্ধ ও শান্তির প্রশ্নে প্রধানমন্ত্রীই মুখ্য ভূমিকা পালন করেন। কমনওয়েলথসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে তিনি দেশের প্রতিনিধিত্ব করেন।

(৬) **প্রধানমন্ত্রী রানী ও ক্যাবিনেটের যোগসূত্র ঃ** প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট ও রানীর মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা পালন করেন। সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্ত তিনি রানীর কাছে পেশ করেন। সরকারের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে রানীর মতামত ক্যাবিনেটে পেশ করেন। রানী কোন বিষয় ক্যাবিনেটের বিবেচনার জন্য পাঠাতে ইচ্ছুক হলে প্রধানমন্ত্রীর মাধ্যমেই তিনি তা ক্যাবিনেটকে জ্ঞাত করেন। প্রধানমন্ত্রীর এই দায়িত্বভার পূর্বের মত এখন আর তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। রানী মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্ত ও নীতির ক্ষেত্রে বিশেষ. হস্তক্ষেপ করেন না।

(৭) **আন্তজার্তিক দায়িত্ব ঃ** প্রধানমন্ত্রীর আর একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক দায়িত্ব বিভিন্ন দেশের

রাষ্ট্রপ্রধানদের সঙ্গে শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হওয়া। কমনওয়েলথ সম্মেলনে গ্রেট ব্রিটেনের প্রতিনিধিত্ব করার দায়িত্ব মূলতঃ প্রধানমন্ত্রীই গ্রহণ করেন।

৯৮.৪.৪ প্রধানমন্ত্রীর সাংবিধানিক মর্যাদা

প্রধানমন্ত্রী হলেন গ্রেট ব্রিটেনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব। তাঁকে কেন্দ্র করেই সরকারের সকল নীতি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ও কার্যকর হয়। তাঁর এই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা উপলব্ধি করেই লর্ড মোর্লি (Lord Morley) তাঁকে 'ক্যাবিনেটরূপী তোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত প্রস্তরখণ্ড' (Key-stone of the Cabinet arch) নামে অভিহিত করেছেন। আবার তাঁকে 'সমমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তিদের মধ্যে অগ্রগণ্য' (First among equals) বলেও বর্ণনা করা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীর ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে একথা বলা যেতে পারে যে তিনি অসীম ক্ষমতার অধিকারী। তবে তাঁর এই ভূমিকা অবশ্যই কয়েকটি উপাদানের ওপর নির্ভরশীল। এইসব উপাদানগুলি হল ঃ প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিত্ব, তাঁর জনপ্রিয়তা, দল ও সহকর্মীদের ওপর প্রভাব, তাঁর প্রশাসনিক ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ইত্যাদি। আইনের দিক থেকে সকল প্রধানমন্ত্রী একই ক্ষমতা ভোগ করেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে কোনও কোনও প্রধানমন্ত্রী ব্রিটিশ রাজনীতিতে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলতে পেরেছেন।

সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে সরকারি দলের অবিসংবাদিত নেতা হিসেবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। তিনি শুধুমাত্র সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাই নন, তিনি রাজা, রানী এবং ক্যাবিনেটের যোগসূত্র। তিনি মন্ত্রীপরিষদের নেতা নন, তাঁকে কেন্দ্র করেই মন্ত্রীসভার উত্থানপতন ঘটে।

আবার অনেক বিশেষজ্ঞের মতে ব্রিটিশ সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রীর বহুমুখী ও ব্যাপক ক্ষমতা তাঁকে একনায়কের পর্যায়ে উন্নীত করেছে। যেহেতু তিনি তাঁর সহকর্মীদের নিয়োগ ও বরখাস্ত করতে পারেন, যেহেতু তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং নিজের দলকে ইচ্ছামত পরিচালনা করতে পারেন, সেহেতু তাঁকে একনায়ক বলাই যুক্তিযুক্ত। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কোনো বিকল্প নেই। আসলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বর্তমানে এত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়ে উঠেছেন যে তাঁকে তাঁর সহকর্মীদের নিয়ন্ত্রক বলা যায়।

তবে সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী সব কিছুর উর্দ্ধে সব কিছুর নিয়ন্ত্রণমুক্ত একজন সব অর্থে স্বেচ্ছাধীন শাসক নন। কারণ প্রধানমন্ত্রীকেও কতকগুলি বিধি-নিষেধের মধ্যে থেকে কাজ করতে হয়। সেই কারণেই প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে একনায়ক হওয়া সম্ভবপর নয়।

প্রধানমন্ত্রীর পরিচ্ছন্ন রাজনৈতিক জীবন, জনপ্রিয়তা ও ব্যক্তিগত আকর্ষণ তাঁর প্রভাব প্রসারিত করে। জনপ্রিয়তার ভিত্তি সুদৃঢ় হলে প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে সহজেই সরকারী সিদ্ধান্ত জনমতের কাছে

গ্রহণযোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়। তাঁর প্রভাব ও গুরুত্ব রাজনৈতিক, সামাজিক এমন কি আন্তর্জাতিক পরিবেশের ওপরেও নির্ভরশীল।

আসলে প্রধানমন্ত্রীর কর্মকুশলতা সম্পূর্ণভাবেই নির্ভরশীল তাঁর ব্যক্তিত্বের ওপর। তিনি যদি অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে শত প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি ব্যাপক ক্ষমতা ভোগ করতে পারেন। আবার তিনি যদি কম ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হন তাহলে শত অনুকূল পরিস্থিতিতেও তাঁর পক্ষে ক্ষমতা উপভোগ করা সম্ভব নয়। তাই ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অ্যাসকুইথ-এর বক্তব্যকে সামনে রেখে একথা বলা যায় যে পদাধিকারী যেভাবে ব্যবহার করতে চান প্রধানমন্ত্রীর পদ ঠিক সেইভাবেই তাঁর সামনে দেখা দেবে।

অনুশীলনী — ৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী কমন্সসভার _____ _____ দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানী প্রধানমন্ত্রীরূপে নিয়োগ করেন।

২। লর্ড মোর্লি প্রধানমন্ত্রীকে 'ক্যাবিনেটরূপী তোরণের মধ্যস্থলে অবস্থিত _____ বলে বর্ণনা করেছেন।

৩। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হলেন মন্ত্রীপরিষদ ও রানীর মধ্যে প্রধান _____।

৯০.৪.৫ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব

স্যার আইভর জেনিংস ক্যাবিনেটকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুরূপে অভিহিত করেছেন। নির্দেশদানের চূড়ান্ত কর্তৃত্ব হল ক্যাবিনেট। ব্রিটিশ ক্যাবিনেট দীর্ঘ বিবর্তনের ফল। মধ্যযুগের মহাপরিষদ (Magnum Concilium) ছিল আধুনিক ক্যাবিনেটের প্রাথমিক রূপ। এই পরিষদের সদস্যরা ছিলেন রাজার পরামর্শদাতা। কর ধার্যসহ অন্যান্য সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে রাজাকে পরামর্শ দান করাই ছিল এই পরিষদের সদস্যদের প্রধান কর্তব্য। রাজকার্যের পরিমাণ বৃদ্ধির ফলে সুষ্ঠুভাবে কার্য পরিচালনার জন্য রাজা কিউরিয়া রেজিস (Curia Regis) বা ক্ষুদ্র পরিষদ নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। নিয়মিতভাবে এই সংস্থার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হত। রাজার প্রধান কর্মচারীদের নিয়েই এই সংস্থা গঠিত হ'ত। কালক্রমে ক্ষুদ্র পরিষদ প্রিভি কাউন্সিলে পরিণত হয়।

ত্রয়োদশ শতকে প্রিভি কাউন্সিল সুষ্ঠু আকার ধারণ করে। প্রিভি কাউন্সিল শাসনবিভাগীয় ক্ষমতার মূল উৎস ছিল। এই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য সংখ্যা বেশি হওয়াতে এই সংস্থা নীতি নির্ধারণ ও দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোন কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারত না। সেই জন্যই রাজা প্রথম জেমস্ ও প্রথম চার্লস্ ক্ষুদ্র একটি গোষ্ঠীর সঙ্গে পরামর্শ করে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দ্বিতীয় চার্লস্ যে

পাঁচজন সদস্যের সঙ্গে পরামর্শ করতেন তাঁদের আদ্যাক্ষর যুক্ত করে ক্যাবাল (Cabal) শব্দের উদ্ভব ঘটে। এই পাঁচজন সদস্য হলেন — ক্লি-ফোর্ড (Clifford), আরলিংটন (Arlington), বাকিংহাম (Buckingham), অ্যাসলী (Ashley), লডারডেল (Lauderdale)। ক্যাবালের কার্যপরিচালনা পদ্ধতি কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছে। এই ক্যাবাল রাজার ব্যক্তিগত প্রভাব বিস্তারে সহায়ক হয়েছে। এই ক্যাবাল থেকেই ক্যাবিনেটের উৎপত্তি।

আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জের শাসনকালে। তিনি ক্যাবিনেটের সভায় উপস্থিত থাকার নীতি বর্জন করেন। রাজা দ্বিতীয় ও তৃতীয় জর্জও ঐ একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছিলেন। ক্যাবিনেটের সকল সিদ্ধান্ত একজন মন্ত্রী রাজার কাছে পেশ করতেন। এই মন্ত্রীই পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পরিচিত হন। এভাবে একদিকে যেমন রাজার প্রভাব হ্রাস পায়, অন্যদিকে তেমন ক্যাবিনেটে একজন প্রাধান্য সৃষ্টিকারী মন্ত্রীরও উদ্ভব ঘটে। অষ্টাদশ শতকে প্রশাসন পরিচালনার প্রয়োজনে ক্যাবিনেটই রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে যোগসূত্রের ভূমিকা গ্রহণ করে। এই শতকের শেষভাগে কমন্সসভা ক্যাবিনেটের ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হয়ে ওঠে। এইসময় রাজা তৃতীয় জর্জ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে নেবার ফলে প্রধানমন্ত্রী পিট সর্বেসর্বা হয়ে ওঠেন। ক্যাবিনেট ব্যবস্থা দ্রুতগতিতে বিকশিত হয়ে ওঠে। ঊনবিংশ শতকে ক্যাবিনেটের গঠন, কার্যাবলী এবং পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্যাবিনেটের সম্পর্ক নির্ধারণকারী বিভিন্ন সাংবিধানিক রীতিনীতির উদ্ভব ঘটে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের কার্যাবলী ও ক্ষমতা সাংবিধানিক রীতিনীতির দ্বারা নির্ধারিত হয়। যেমন ক্যাবিনেট গঠনের বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা প্রধানমন্ত্রীর হাতে ন্যস্ত থাকে। আবার ক্যাবিনেট-এর সকল সিদ্ধান্তের জন্য মন্ত্রীগণ কমন্সসভার কাছে যৌথভাবে দায়িত্বশীল থাকে।

৯৮.৪.৬ ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীপরিষদ

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা দুটি শব্দই ব্যবহৃত হয়। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে এই দুটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য আছে। গ্রেট ব্রিটেনের কমন্সসভায় সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের নেতাই ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভা গঠন করে। ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভার সদস্যরা সকলেই পার্লামেন্টের সদস্য এবং ক্যাবিনেট ও মন্ত্রীসভার মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও উভয়ের মধ্যে কতকগুলি পার্থক্য বিদ্যমান।

প্রথমত ঃ গঠনগত দিক থেকে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য অতি স্পষ্ট। মন্ত্রীসভা ক্যাবিনেটের তুলনায় আয়তনে অনেক বড়। ব্রিটেনের সব মন্ত্রীকে নিয়েই মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। এই মন্তিসভার গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের সব সদস্যই মন্ত্রিসভার সদস্য। কিন্তু মন্ত্রিসভার সব সদস্য ক্যাবিনেটের সদস্য নন।

দ্বিতীয়ত ঃ ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সব সদস্যই প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য। কিন্তু মন্ত্রিসভার সব সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নন।

তৃতীয়ত ঃ ক্যাবিনেটই রাজা বা রানীকে শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে পরামর্শ দিয়ে থাকে। কিন্তু মন্ত্রিসভা এই গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা থেকে বঞ্চিত।

চতুর্থত ঃ সাধারণতঃ সপ্তাহে একদিন ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। তবে পার্লামেন্টের অধিবেশন চলাকালীন সপ্তাহে দু'বারও ক্যাবিনেটের বৈঠক বসে। কিন্তু মন্ত্রিসভার বৈঠকের ব্যাপারে এই ধরণের কোনও নিয়ম নেই। মন্ত্রিসভার বৈঠক অনিয়মিতভাবেই আহূত হয়।

পঞ্চমত ঃ গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট যৌথভাবে একটি টিম হিসেবে কাজ করে। কিন্তু মন্ত্রিসভার সদস্যগণ সাধারণতঃ নিজের নিজের বিভাগীয় দায়িত্বে কাজ করেন, টিম হিসেবে নয়।

ষষ্ঠত ঃ গ্রেট ব্রিটেনে ক্যাবিনেটই কেবলমাত্র সরকারি নীতি নির্ধারণ করার ক্ষমতা ভোগ করে। এই নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে মন্ত্রিসভার কোনও আলাদা ক্ষমতা নেই।

সপ্তমত ঃ ক্যাবিনেটের কোনও আইনগত ভিত্তি নেই। এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু মন্ত্রিসভা হল একটি আইনগত সংস্থা।

পরিশেষে বলা যায় যে ক্যাবিনেটের সদস্যদের গোপনীয়তা রক্ষা করে চলতেই হয়; ক্যাবিনেট বহির্ভূত মন্ত্রীদের সর্বপ্রকার তথ্যের ভার বহন করতে হয় না।

ব্রিটেনকে ক্যাবিনেট পরিচালিত শাসনব্যবস্থা বলে বর্ণনা করা হয় বলে মন্ত্রিসভার সঙ্গে ক্যাবিনেটের পার্থক্য নিরূপণ করা অত্যন্ত প্রয়োজন।

অনুশীলনী — ৪

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) ক্যাবাল শব্দটি থেকে ক্যাবিনেট শব্দটির জন্ম।

(খ) মন্ত্রিপরিষদ ও ক্যাবিনেটের মধ্যে পার্থক্য আছে।

(গ) ব্রিটেনে ক্যাবিনেটের সব সদস্য প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য নয়।

(ঘ) ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের আইনগত ভিত্তি আছে।

৯৮.৪.৭ পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেট

সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় পার্লামেন্টের কর্তৃত্বের পরিবর্তে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সুতরাং পার্লামেন্টের সঙ্গে ক্যাবিনেটের সম্পর্ক নির্ণয় অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয়।

তত্ত্বগত ধারণা অনুযায়ী ব্রিটেনের আইনসভাই আইনপ্রণয়নের অধিকারী। কিন্তু বাস্তবে ব্রিটিশ

পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা আজ আনুষ্ঠানিক ক্ষমতায় পরিণত হয়েছে। বর্তমানে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে যে সমস্ত আইন প্রণীত হয় তার খসড়া প্রস্তাত করে ক্যাবিনেট এবং তা উত্থাপনও করেন কোনও না কোনও মন্ত্রী। ক্যাবিনেটের সদস্যরা যেহেতু সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা সেহেতু পার্লামেন্ট, বিশেষত কমন্সসভার সাধারণ সদস্যরা ক্যাবিনেটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করার মত সাহস দেখান না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দুটি কক্ষ নিয়ে গঠিত। উচ্চকক্ষ লর্ডস্‌ভা ও নিম্নকক্ষ কমন্সসভা। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতি অনুসারে সরকারি আয়ব্যয়ের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু বর্তমানে সমন্সসভার ভূমিকা কার্যত অর্থহীন হয়ে পড়েছে। বাৎসরিক বাজেট কমন্সসভার তরফ থেকে শুধু পেশই করা হয়। কমন্সসভার সদস্যদের বিশেষীকৃত কোন জ্ঞান না থাকার দরুণ কোনও আলোচনা ছাড়াই বাজেট কমন্সসভায় অনুমোদিত হয়। আর অর্থ সংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ফলে এই সুযোগে পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে এবং ক্যাবিনেটের ক্ষমতাবৃদ্ধি হয়েছে।

সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন করাই পার্লামেন্ট বা আইনসভার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমানকালে জটিল সমাজব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের জন্য যে বিশেষ জ্ঞানের প্রয়োজন আইনসভার বেশির ভাগ সাধারণ সদস্যেরই তা থাকে না। তদুপরি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সমস্যা বর্তমানে জটিল থেকে জটিলতর হওয়ার ফলে বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য যে বিপুল আইন প্রণয়ন প্রয়োজন তা প্রণয়ন করার সময় ও সুযোগ কোনটাই পার্লামেন্টের বিশেষত আইনসভার হয় না। এই অবস্থায় পার্লামেন্ট আইনের মূল নীতিগুলি নির্ধারণ করে সেগুলিকে পূর্ণাঙ্গ রূপদানের ক্ষমতা শাসনবিভাগের হাতে অর্পণ করে। একেই বলা হয় অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন। এই অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইনের পরিধি যতই প্রসারিত হচ্ছে ক্যাবিনেটের কর্তৃত্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং পার্লামেন্টের ক্ষমতা ততই সঙ্কুচিত হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায় যে কমন্সসভার কাছ থেকে প্রতিনিয়ত বিরোধিকার সম্মুখীন হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা ভেঙে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের মাধ্যমে কমন্সসভা গঠনের জন্য রাজা বা রানীকে পরামর্শ দিতে পারেন।

তবে ক্যাবিনেটের ক্ষমতার ওপর কিছু সীমাবদ্ধতা আছে। সেগুলি হল ঃ

(ক) ক্যাবিনেট পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করলেও তাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করতে পারে না।

(খ) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে শক্তিশালী বিরোধী দলের অস্তিত্ব ক্যাবিনেটকে সংযত থাকতে বাধ্য করে।

(গ) পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে প্রশ্নোত্তর পর্ব, মুলতুবি প্রস্তাব উত্থাপন, বাজেট বিতর্ক ইত্যাদির মাধ্যমেও পার্লামেন্ট অর্থাৎ কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

৯৮.৪.৮ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য

ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্যে দিয়ে ব্রিটেনে যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আছে।

(১) ক্যাবিনেট সাংবিধানিক রীতিনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী পার্লামেন্ট প্রণীত কোন আইনের দ্বারা নির্ধারিত নয়। ১৯৩৭ সালের 'রাজকীয় মন্ত্রী আইন'-এ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উল্লেখ থাকলেও তা খুবই সংক্ষিপ্ত। এখানে এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতির ওপর নির্ভরশীল।

(২) ব্রিটেনে ক্যাবিনেটই মুখ্য শাসক। ক্যাবিনেটই রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী ও প্রয়োগকারী সংস্থা। সরকারের সাফল্য ও ব্যর্থতার দায় সমবেতভাবে ক্যাবিনেটকেই গ্রহণ করতে হয়।

(৩) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য দিক হ'ল, এই ব্যবস্থা দলীয় শাসনব্যবস্থা। কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে। দলের নেতা রাজা বা রানী কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হন। দলের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রধানমন্ত্রী অন্যান্য মন্ত্রীকে নিয়োগ করার জন্য রানীকে পরামর্শ দেন। প্রত্যেক মন্ত্রী দলীয় নীতি ও শৃংখলার দ্বারা আবদ্ধ। দলের নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ক্যাবিনেট সরকারী নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

(৪) প্রধানমন্ত্রীর অবিসংবাদিত নেতৃত্ব ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। গত কয়েক দশক ধরে প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও প্রভাব এত বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে যে অনেকে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা' নামে উল্লেখ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট সভায় সভাপতিত্ব করেন এবং সরকারী নীতি প্রণয়নে প্রধান ভূমিকা পালন করেন। সরকার ও সরকারী দলের সাফল্য ও প্রভাব প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বের ওপর নির্ভরশীল।

(৫) আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার পঞ্চম গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। এখানকার সংসদীয় ব্যবস্থায় যেহেতু ক্যাবিনেটের সদস্যরা পার্লামেন্টেরও সদস্য, সেহেতু এখানে আইনবিভাগ ও শাসনবিভাগের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক বর্তমান। ফলে ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্তের পেছনে পার্লামেন্টের সক্রিয় সমর্থন থাকে। অন্যদিক দিয়ে দেখতে গেলে ব্রিটেনে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি অনুপস্থিত।

(৬) গ্রেট ব্রিটেনের ক্যাবিনেট ব্যবস্থার একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল যৌথ দায়িত্বশীলতা। পার্লামেন্টিয় ব্যবস্থায় মন্ত্রীদের এই দায়িত্বশীলতার প্রকৃতি দুই ধরনের—ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও যৌথ দায়িত্বশীলতা। মন্ত্রীরা যেমন একদিকে কোন একটি প্রশাসনিক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত, অন্যদিকে তেমনি মন্ত্রীরা যৌথভাবে সমগ্র ক্যাবিনেটের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সেই কারণেই কোন মন্ত্রীকে যেমন তাঁর দপ্তরের রাজকর্মের জন্য কমন্সসভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হয়, তেমনি অন্যদিকে ক্যাবিনেট

কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেটকে যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

(৭) গোপনীয়তা রক্ষা করা ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থার আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ক্যাবিনেট যেহেতু একটি দলীয় কমিটিরূপে কার্যপরিচালনা করে সেহেতু প্রায় সব ব্যাপারেই ক্যাবিনেট গোপনীয়তা রক্ষা করে। কার্যভার গ্রহণ করার আগে প্রত্যেক মন্ত্রীকেই গোপনীয়তার শপথ গ্রহণ করতে হয়।

(৮) ব্রিটিশ ক্যাবিনেট একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য গঠিত হয়। কিন্তু পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের আস্থা হারালে ক্যাবিনেটকে পদত্যাগ করতেই হয়।

৯৮.৪.৯ ক্যাবিনেটের গঠন ও কার্যাবলী

শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার ওপর প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ ক্যাবিনেট ব্যবস্থা ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছে। যদিও এই ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উৎপত্তি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞগণ একমত নন, তবু এককথায় বলা যায় যে অতীতের প্রিভি কাউন্সিল থেকে বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থার উদ্ভব। তবে আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জ-এর সময় থেকে।

৯৮.৪.৯ ক ক্যাবিনেটের গঠন

গ্রেট ব্রিটেনে কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দল সরকার গঠন করে এবং ঐ দলের নেতা বা নেত্রীকে রানী মন্ত্রিসভা গঠনের জন্য আহ্বান জানান। এই মন্ত্রিসভা থেকে কোনও কোনও গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। মন্ত্রিসভা পাঁচ বছরের জন্য গঠিত হয়। ক্যাবিনেটেরও স্থায়িত্ব তাই পাঁচ বছর। তবে তার মধ্যে কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। সেই সঙ্গে ক্যাবিনেটও বাতিল হয়ে যায়।

কতজন সদস্য নিয়ে ব্রিটিশ ক্যাবিনেট গঠিত হবে সে সম্পর্কে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম নেই। ক্যাবিনেটের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক নিযুক্ত হন এবং ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যাও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়। কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রী নিযুক্ত করা হবে প্রধানমন্ত্রীই সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। সাধারণভাবে ১৪ থেকে ২৪ জন সদস্য নিয়ে ক্যাবিনেট গঠিত হয়। ১৯২২ সালে গ্রেট ব্রিটেনে যে ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্যসংখ্যা ছিল ১৪। এটিই ছিল ব্রিটেনের ক্ষুদ্রতম ক্যাবিনেট। আবার ১৯৬৪ সালে প্রধানমন্ত্রী উইলসনের নেতৃত্বে যে ক্যাবিনেট গঠিত হয়েছিল তার সদস্য সংখ্যা ছিল ২৪। ১৯৮৪ সালে মার্গারেট থ্যাচারের ক্যাবিনেটের সদস্যসংখ্যা ছিল ২১।

ক্যাবিনেটের সদস্য হতে গেলে সেই ব্যক্তিতে প্রথমত পার্লামেন্টের সদস্য হতে হবে। দ্বিতীয়ত ব্যক্তির রাজনৈতিক যোগ্যতা ও প্রশাসনিক দক্ষতা থাকা প্রয়োজন। তৃতীয়ত সেই ব্যক্তির প্রধানমন্ত্রীর

নেতৃত্বের প্রতি আস্থাশীল হওয়া প্রয়োজন। চতুর্থত পার্লামেন্টের সদস্য হিসেবে কাজ করার কিছু অভিজ্ঞতা থাকা প্রয়োজন। পঞ্চমত প্রতিটি ভৌগোলিক অঞ্চল যাতে প্রতিনিধিত্ব পায় সেদিকেও প্রধানমন্ত্রীকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ক্যাবিনেট সাধারণতঃ ট্রেজারির প্রথম লর্ড, পররাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, প্রিভি কাউন্সিলের সভাপতি এবং অন্যান্য ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ক্যাবিনেটের মধ্যে আবার ইনার ক্যাবিনেট, কিচেন ক্যাবিনেট এবং শ্যাডো ক্যাবিনেটও থাকে। প্রথম দুটি হল প্রধানমন্ত্রীর অতি বিশ্বস্ত এবং দলের একেবারে প্রথমসারির নেতাদের একান্ত ঘনিষ্ট গোষ্ঠীর অন্য নাম। শ্যাডো ক্যাবিনেট বা ছায়া মন্ত্রিপর্ষদ হল বিরোধী দলের প্রথম সারির নেতাদের নিয়ে গঠিত একটি বিকল্প গোষ্ঠী। যার সদস্যরা অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে সরকারের এক একটি বিভাগের কাজ পর্যবেক্ষণ করে এবং যদি কখনো মন্ত্রিসভার পতন হয় তখন ওই ছায়া মন্ত্রিপর্ষদই যেন ক্ষমতা গ্রহণের জন্য তৈরি থাকে।

৯৮.৪.৯ খ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী

গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট হল শক্তিশালী কার্যনিবহী সংস্থা। ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ও কার্যবিলীকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে উপস্থাপিত করতে পারি—

(১) **নীতি নির্ধারণ ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় ক্যাবিনেট একটি নীতি নির্ধারণকারী সংস্থা। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করার পর ক্যাবিনেট নীতি নির্ধারণ করে। ঐ নীতির ভিত্তিতেই পরে অন্যান্য বিভাগের নীতি নির্ধারিত হয়। প্রত্যেক বিভাগের দায়িত্ব হল ক্যাবিনেট কর্তৃক নির্ধারিত নীতিকে বাস্তবায়িত করা। ক্যাবিনেট কেবল বর্তমান সমস্যা সমাধানের জন্যই নীতি নির্ধারণ করে না। সম্ভাব্য সকল সমস্যা সমাধানের জন্য দীর্ঘকালীন পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

(২) **আইন প্রণয়ন ঃ** ক্যাবিনেটের সিদ্ধান্ত অনুসারেই পার্লামেন্টে বিল উত্থাপিত হয়। যে সব বিষয়ে পার্লামেন্টের অনুমোদন প্রয়োজন, ক্যাবিনেট মন্ত্রীরা সেইসব বিষয়ে নীতি নির্ধারণ, সিদ্ধান্তগ্রহণ ও বিলের খসড়া তৈরী করে পার্লামেন্টের কাছে তা পেশ করেন। বর্তমানে কেবল বিল উত্থাপন করেই ক্যাবিনেট ক্ষান্ত থাকে না ; পার্লামেন্টে বিলটি অনুমোদন করিয়ে নেবার দায়িত্বও ক্যাবিনেটকে গ্রহণ করতে হয়।

(৩) **অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন ও ক্যাবিনেটের দায়িত্ব ঃ** আইন প্রণয়ন পার্লামেন্টের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা হলেও নানা কারণে এই সংক্রান্ত কিছু ক্ষমতা পার্লামেন্ট শাসন বিভাগের হাতে হস্তান্তরে বাধ্য হয়েছে। এর ফলে ক্যাবিনেটের দায়িত্ব ও ক্ষমতা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রণীত আইনের প্রয়োগযোগ্যতা নিশ্চিত করতে, তাকে বিশদ চেহারা দেওয়া এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে নানা উপধারা প্রণয়ন এই অর্পিত আইনপ্রণয়নের উদ্দেশ্য।

(৪) **পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন ঃ** পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন এবং তাকে বাস্তবে কার্যকর করার ক্ষেত্রেও ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা থেকে শুরু করে অধিবেশন স্থগিত রাখা বা পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে ক্যাবিনেটই রাজা বা রানীর প্রধান পরামর্শদাতা। পার্লামেন্টের অধিবেশন শুরু হওয়ার আগে কোন্ কোন্ বিল উত্থাপন করা হবে, কোন্ কোন্ প্রস্তাবের ওপর কে কে বক্তব্য রাখবেন, সরকার পক্ষের মূল বক্তা কে কে হবেন, বিরোধী পক্ষ বলার জন্য কতক্ষণ সময় পাবে, তার সব কিছুই ক্যাবিনেট কর্তৃক স্থিরীকৃত হয়।

(৫) **শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ ঃ** ক্যাবিনেটের অন্যতম মুখ্য দায়িত্ব হল শাসনবিভাগের সর্বোচ্চ নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন। শাসনবিভাগের ক্ষমতা আইনগতভাবে রানীর হাতে ন্যস্ত। তবে বাস্তবে রানী ক্যাবিনেটের পরামর্শ অনুযায়ী এই ক্ষমতা ভোগ করেন। ক্যাবিনেট প্রশাসনিক কর্তৃত্বের শীর্ষদেশে অবস্থিত। বিভিন্ন বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা ক্যাবিনেটের দ্বারা নির্ধারিত নীতি অনুযায়ী বিভাগীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

(৬) **বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন ঃ** প্রশাসনকে সঠিকভাবে পরিচালনা করতে হলে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের কাজের মধ্যে সঙ্গতি থাকা দরকার। এই সঙ্গতিসাধনের কাজটি করে ক্যাবিনেট। বিভিন্ন বিভাগের কার্যাবলীর মধ্যে সমন্বয়সাধনের দায়িত্ব পালিত না হলে সরকারের সাফল্য ক্ষুণ্ণ হয়।

(৭) **পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়ন ঃ** বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কিত নীতি নির্ধারণ এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণের দায়িত্ব শাসনবিভাগকেই সম্পাদন করতে হয়। গ্রেট ব্রিটেনে এই দায়িত্ব বহন করে ক্যাবিনেট। ক্যাবিনেটে পররাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত স্বতন্ত্র মন্ত্রী থাকেন। কিন্তু বাস্তবে পররাষ্ট্রনীতি প্রণয়নের ক্ষমতা এখন ক্যাবিনেটের হাত থেকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে কেন্দ্রীভূত হয়েছে। যেমন — আর্জেন্টিনার ফকল্যাণ্ড দ্বীপ দখল করার সিদ্ধান্ত এককভাবে প্রধানমন্ত্রী মার্গারেট থ্যাচার গ্রহণ করেছিলেন।

(৮) **সংযোগসাধনমূলক কার্যাবলী ঃ** সরকারের অন্যতম প্রধান কর্তব্য হল জনসাধারণকে সরকারী নীতি, সিদ্ধান্ত ও কার্যাবলী সম্পর্কে অবহিত রাখা। এই কারণে সরকার তথ্যদপ্তর, বেতার, দূরদর্শন, পুস্তিকা, সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন প্রকাশ, সাংবাদিক সম্মেলন এবং পার্লামেন্টে বিভিন্ন বিষয়ে তথ্য পেশ করে। এই তথ্যের মাধ্যমে সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপিত হয়। এই কারণেই ব্রিটিশ ক্যাবিনেটও জনসংযোগমূলক কার্যাবলীর ওপর গুরুত্ব আরোপ করে।

(৯) **বাজেট প্রণয়ন ঃ** অর্থমন্ত্রী বাজেট প্রস্তাব ক্যাবিনেটে পেশ করেন। ক্যাবিনেটে আলোচনার পরই বাজেট চূড়ান্ত রূপ লাভ করে এবং অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় বাজেট পেশ করেন। প্রত্যেক মন্ত্রীর দায়িত্ব হল কমন্সসভায় বাজেটকে সমর্থন করা। কমন্সসভায় বাজেট প্রস্তাব প্রত্যাখ্যাত হলে ক্যাবিনেটকে

পদত্যাগ করতে হয়। তাই পার্লামেন্টে বাজেট পেশের আগে ক্যাবিনেটের সভায় পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়।

(১০) নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা : ক্যাবিনেটের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ সংক্রান্ত ক্ষমতা আছে। যেমন অর্থদপ্তরের সচিব, ক্যাবিনেটের পরিকল্পনা বিষয়ক অফিসার বা রাজপরিবারের কোন ব্যক্তিকে গভর্ণর জেনারেলের পদে নিয়োগ প্রভৃতির ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের সঙ্গে পরামর্শ করা হয়। বিচারপতি, রাষ্ট্রদূত, বাণিজ্যিক প্রতিনিধি ইত্যাদি পদে নিয়োগের মূল দায়িত্বও ক্যাবিনেটের। রানীর নামে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ নিয়োগ কার্যকর হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। কিন্তু বিগত কয়েক দশক ধরে ক্যাবিনেটের পরিবর্তে প্রধানমন্ত্রীর অপ্রতিহত প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর একক ইচ্ছাই ক্যাবিনেটের ইচ্ছায় পরিণত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ মার্গারেট থ্যাচারের নাম উল্লেখ করা যায়। এই কারণে বর্তমানে অনেক বিশেষজ্ঞই গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে 'প্রধানমন্ত্রী শাসিত শাসনব্যবস্থা' নামে অভিহিত করার পক্ষপাতী।

৯৮.৫ সারাংশ

গ্রেট ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। এখানে একজন নিয়মতান্ত্রিক শাসক আছেন। তিনি হলেন রাজা বা রানী। তিনি নামে শাসক। কিন্তু প্রকৃত ক্ষমতা ন্যস্ত আছে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের হাতে। ব্রিটেনের এই রাজশক্তি বর্তমানে পৃথিবীর মধ্যে প্রাচীনতম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। রাজা বা রানীর কিছু রাজকীয় বিশেষাধিকার আছে। রাজশক্তির ক্ষমতার আর একটি উৎস হল পার্লামেন্ট প্রণীত আইন। তবে বর্তমান পরিস্থিতি বিবেচনা করলে আমরা বলতে পারি যে রাজতন্ত্র এখন একটি বিতর্কিত প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। এক হাজার বছরের এই প্রতিষ্ঠানটি এখন অবক্ষয়ের দিকে।

ব্রিটেনে প্রকৃত শাসনক্ষমতা ন্যস্ত আছে প্রধানমন্ত্রীসহ মন্ত্রিপরিষদের হাতে। মন্ত্রিপরিষদ সব মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হয়। ক্যাবিনেট মন্ত্রিসভারই একটি অংশ। গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়েই ক্যাবিনেট গঠিত হয়। কোন্ দপ্তর এবং কোন্ কোন্ মন্ত্রীকে ক্যাবিনেট মন্ত্রীর পর্যায়ে উন্নীত করা হবে, তা প্রধানমন্ত্রীর সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। ক্যাবিনেট মন্ত্রী, রাষ্ট্রমন্ত্রী এবং সংসদীয় সচিবদের নিয়ে মন্ত্রিসভা বা মন্ত্রিপরিষদ গঠিত হয়।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে গ্রেট ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। বিংশ শতাব্দীতে তার স্থান অধিগ্রহণ করেছে ক্যাবিনেটের একনায়কত্বের ধারণা। তবে বাস্তবে মন্ত্রিসভা ও ক্যাবিনেটের প্রধান হিসাবে প্রধানমন্ত্রী হলেন সর্বোচ্চ কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি। বিশেষতঃ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরবর্তীকালের পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পায়।

তাই অনেক বিশেষজ্ঞ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থাকে প্রধানমন্ত্রী **শাসিত** শাসনব্যবস্থা বলে অভিহিত করেছেন। তবে তাঁকে একনায়ক বলা যায় কিনা সে বিষয়ে মত পার্থক্য আছে। অবশ্য এ কথা ঠিক যে পদাধিকারী বিচক্ষণ ও ব্যক্তিত্বসম্পন্ন হলে এবং পিছনে শাসকদলের দৃঢ় ও সক্রিয় সমর্থন ও সহযোগিতা থাকলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারেন।

৯৮.৬ সর্বশেষ অনুশীলণী

১। আধুনিক অর্থে ব্রিটেনে ক্যাবিনেট প্রথার উদ্ভব কবে থেকে ?

২। কমন্সসভা কিভাবে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে ?

৩। সংক্ষেপে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী কি কি?

৪। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের যৌথ দায়িত্ব বলতে কি বোঝায়?

৫। ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব বলতে, কি বোঝায়?

৯৮.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

১। ব্রিটেনের রাজশক্তির ক্ষমতার প্রধান দুটি উৎস হল (ক) রাজকীয় বিশেষাধিকার এবং (খ) পার্লামেন্ট প্রণীত আইন।

২। ব্রিটেনের রাজা বা রানীর বিশেষাধিকার সম্পর্কিত রীতিনীতির মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য হল (ক) আইনসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা রাজা বা রানী কর্তৃক প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত হবেন; (খ) পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত বিলে রাজা বা রানী স্বাক্ষর করতে বাধ্য।

৩। কোন নির্দিষ্ট সময়ে নিজের বিচার বিবেচনা অনুসারে কাজ করার আইনগত ক্ষমতার যে অবশিষ্টাংশ এখনও রাজা বা রানীর হাতে আছে তাকেই রাজশক্তির বিশেষাধিকার বলে।

অনুশীলনী — ২

১। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক হলেন রাজা বা রানী।

২। কমন্সসভার সংগরিষ্ঠ দলের নেতাকে রাজা বা রানী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিযুক্ত করেন।

৩। উপনিবেশগুলি সম্পর্কে ব্রিটেনের রাজা বা রানী বা রাজশক্তি প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে যেসব আদেশ বা নির্দেশ ঘোষণা করেন, সেগুলিকে স-পরিষদ রাজাজ্ঞা বলে।

৪। রাজা বা রানীর একটি বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা হল তিনি বিচারালয়ে দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তির দণ্ড হ্রাস

বা মকুব করতে পারেন তবে এই ক্ষমতা তিনি ব্যবহার করতে পারেন মন্ত্রিপরিষদের পরামর্শ অনুযায়ী।

অনুশীলনী — ৩

১। নিরঙ্কুশ, সংখ্যাগরিষ্ঠ।

২। প্রস্তরখণ্ড।

৩। যোগসূত্র।

সর্বশেষ অনুশীলনী ঃ

১। আধুনিক অর্থে ক্যাবিনেট প্রথার সূত্রপাত হয়েছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজা প্রথম জর্জের সময়। রাজা প্রথম জর্জ যেহেতু ক্যাবিনেট সভায় উপস্থিত থাকতেন না সেহেতু তাঁর সময় থেকেই ক্যাবিনেট গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত হতে থাকে এবং প্রাধান্য পেতে শুরু করে।

২। সাধারণত যে সমস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে কমন্সসভা ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করে সেগুলি হলো—(ক) প্রশ্নজিজ্ঞাসা, (খ) নিন্দাসূচক প্রস্তাব, (গ) মুলতুবি প্রস্তাব, (ঘ) ব্যয়বরাদ্দ হ্রাসের প্রস্তাব, (ঙ) অনাস্থা প্রস্তাব।

৩। ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের কার্যাবলী হল ঃ (ক) নীতি নির্ধারণ, (খ) আইন প্রণয়ন, (গ) পার্লামেন্টের কর্মসূচী প্রণয়ন, (ঘ) শাসনবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ, (ঙ) বিভিন্ন দপ্তরের কাজের মধ্যে সমন্বয় (চ) বাজেট প্রণয়ন ইত্যাদি।

৪। ব্রিটেনে মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতার প্রকৃতি দুই ধরনের—ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা ও যৌথ দায়িত্বশীলতা। প্রত্যেক মন্ত্রীকে যেমন তাঁর দপ্তরের কাজকর্মের জন্য কমন্সসভার কাছে ব্যক্তিগতভাবে জবাবদিহি করতে হয় তেমন অন্যদিকে ক্যাবিনেট কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তের জন্য ক্যাবিনেটকে যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয়।

৫। উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য ছিল পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে এই ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। পার্লামেন্টের ক্ষমতা অস্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ক্যাবিনেটের এই অস্বাভাবিক ক্ষমতা বৃদ্ধিকেই 'ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব' বলে চিহ্নিত করা হয়।

৯০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J. Harvey and L. Bather, MacMillan* — The British Constitution, St. Martin's Press, 1970.

২। *Sir Ivor Jennings* — Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959.

৩। ডঃ *অনাদিকুমার মহাপাত্র* — নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

৪। *সত্যসাধন চক্রবর্তী* ও *নির্মলকান্তি ঘোষ* — তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। *সুদর্শন ভট্টাচার্য* — তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি (প্রশ্নোত্তরে), ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ৯৯ □ পার্লামেন্ট

গঠন

৯৯.১ উদ্দেশ্য

৯৯.২ প্রস্তাবনা

৯৯.৩ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ক্রমবিকাশ

৯৯.৩.১ লর্ডসভা

৯৯.৩.২ কমন্সসভা

৯৯.৩.৩ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

৯৯.৩.৪ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

৯৯.৪ সারাংশ

৯৯.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

৯৯.৬ উত্তরমালা

৯৯.৭ গ্রন্থপঞ্জী

৯৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন ঃ

- ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কীভাবে গঠিত হয়েছিল।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুটি কক্ষ লর্ডসভা ও কমন্সসভার গঠন ও কার্যাবলী।
- নিম্নকক্ষ কমন্সসভায় বিরোধীদলের ভূমিকা।
- ব্রিটিশ পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি ও কমিটি ব্যবস্থা।

৯৯.২ প্রস্তাবনা

ব্রিটেনে পার্লামেন্টীয় ব্যবস্থা প্রবর্তিত আছে। এখানে তত্ত্বগতভাবে পার্লামেন্ট সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। ব্রিটেনে যেহেতু অলিখিত সংবিধান এবং শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রাধান্য সেহেতু পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও ভূমিকাও অনেকটাই শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। পার্লামেন্টের একটি অগণতান্ত্রিক উপাদান হল লর্ডসভা। বস্তুতঃ পার্লামেন্টের ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়।

এই এককে লর্ডসভা ও কমন্সসভা দুটি নিয়েই বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। কমন্সসভাই যেহেতু মূল ক্ষমতার অধিকারী সেহেতু কমন্সসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচিত হয়েছে। তবে সেই সঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তত্ত্বগতভাবে কমন্সসভা সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তা ক্যাবিনেটের একনায়কত্বে এসে পৌঁছেছে। বর্তমানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব আবার এসে পৌছেছে প্রধানমন্ত্রীর একনায়কত্বে।

৯৯.৩ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট—ক্রমবিকাশ

পার্লামেন্ট গ্রেট ব্রিটেনের আইন প্রণয়নের সর্বোচ্চ সংস্থা। রাজা বা রানী, লর্ডসভা এবং কমন্সসভা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত। ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে সাধারণত রাজাসহ-পার্লামেন্ট নামে অভিহিত করা হয়।

বর্তমান পার্লামেন্ট কয়েক শতাব্দীর ক্রমবিকাশের ফল। শাসন পরিচালনার সুবিধার জন্য উইলিয়ম নিজের মনোনীত সামন্ত, নাইট উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং যাজকদের নিয়ে একটি 'মহাপরিষদ' গঠন করেন। এই মহাপরিষদই ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিবর্তনে প্রাথমিক স্তর। চতুর্দশ শতকের মধ্যভাগে সামন্তশ্রেণী, যাজক এবং নাইট ও বার্জেসগণ পৃথকভাবে মিলিত হতেন। এর ফলে পার্লামেন্ট তিনটি কক্ষে পরিণত হতে আরম্ভ করে। পরে সামন্তশ্রেণী ও যাজকদের একটি কক্ষে এবং নাইট, বার্জেস ও নাগরিকদের আর একটি কক্ষে মিলিত হবার ব্যবস্থা করা হয়। প্রথম কক্ষটি লর্ডসভা ও দ্বিতীয় কক্ষটি কমন্সসভা নামে পরিচিতি লাভ করে। তখন থেকেই ব্রিটেনে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভার সূত্রপাত।

৯৯.৩.১ লর্ডসভা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হল লর্ডসভা। শুধুমাত্র ব্রিটিশ পার্লামেন্টেই নয়, লর্ডসভা হল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আইনসভাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম দ্বিতীয় কক্ষ। বিশ্বের প্রাচীনতম এই উচ্চকক্ষ ব্রিটেনের অন্যান্য সরকারি সংস্থার মত দীর্ঘদিনের ক্রমবিকাশের ফল। লর্ডসভার একটি বৈশিষ্ট্য হল এই যে আবির্ভাবের সময় থেকে শুরু করে আজ অবধি এই কক্ষ কখনও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয় নি।

গঠন

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভা বর্তমানে বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিতীয় কক্ষ। বর্তমানে লর্ডসভা নিম্নলিখিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত।

(১) রাজপরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত সদস্যগণ।

(২) উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত পিয়ার সম্প্রদায়ভুক্ত লর্ডগণ।

(৩) স্কটল্যাণ্ডের উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত লর্ড উপাধিধারী লর্ডসভার সদস্যগণ।

(৪) আয়ারল্যান্ডের লর্ডগণ। (বর্তমানে লর্ডসভায় আয়ারল্যান্ডের লর্ড নেই।)

(৫) দেশের প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের মধ্যে থেকে নয়জন বেতনভুক্ত আপিল লর্ড এই সভার সদস্য।

(৬) লর্ডসভার সদস্যদের মধ্যে ২৬ জন ধর্মীয় লর্ড আছেন।

(৭) শিল্প, বিজ্ঞান, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতি ক্ষেত্র থেকে নিযুক্ত আজীবন লর্ডগণ লর্ডসভার সদস্য। উল্লেখযোগ্য, ব্রিটেনে বসবাসকারী ভারতীয় অধ্যাপক মেঘনাদ দেশাই ও প্রখ্যাত শিল্পপতি স্বরাজ পল লর্ড উপাধি প্রাপ্ত হয়ে এই সভার সদস্য হয়েছেন।

উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডসভার সদস্যপদপ্রাপ্ত লর্ডদের পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ ডিউক (Duke), মার্কোয়েস (Marquess), আর্ল (Earl), ভাইকাউন্ট (Viscount) এবং ব্যারন (Barons)। পূর্বে একমাত্র পুরষরাই পিতার মৃত্যুর পর লর্ডসভার সদস্যপদ অর্জনের অধিকারী ছিল। মহিলাদের অধিকার স্বীকৃত ছিল না। পরে মহিলাদের ক্ষেত্রেও এই অধিকার সম্প্রসারিত হয়েছে। উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ড উপাধিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের লর্ডসভার অধিবেশনে যোগদানের অধিকার আছে। তবে তার বয়স কমপক্ষে একুশ বছর হতে হবে।

কার্যাবলী

গ্রেট ব্রিটেনের লর্ডসভা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীনতম দ্বিতীয় কক্ষ হলেও বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে লর্ডসভার ক্ষমতা ও গুরুত্ব যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমরা বলতে পারি যে দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে লর্ডসভা এখনও কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। লর্ডসভার এই সমস্ত কাজকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যেমন---

(১) **আইন সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** লর্ডসভা আইনসভার উচ্চকক্ষ। সেই হিসেবে আইন প্রণয়নে অংশগ্রহণ করাই লর্ডসভার প্রথম কাজ। এই প্রসঙ্গে বলা যায় যে ১৯১১ সালের আগে আইনসংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভা যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করলেও পরবর্তী সময়ে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ১৯৪৯ সালে প্রণীত আইনের ফলে লর্ডসভার ক্ষমতা আরও কমে যায়। বর্তমানে সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা এক বছর বিলম্ব ঘটাতে পারে এবং অর্থবিলের ক্ষেত্রে বিলটিকে এক মাস আটকে রাখতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভা কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (ক) অপেক্ষাকৃত কম বিতর্কিত বিলগুলি লর্ডসভায় উত্থাপিত ও আলোচিত হওয়ার পর তা কমন্সসভায় যায়। (খ) লর্ডসভা আইনের সংশোধনী কাজের দায়িত্ব পালন করে। (গ) অর্পিত ক্ষমতাপ্রসূত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এবং বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা যে ভূমিকা পালন করে তা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। (ঘ) কমন্সসভার তুলনায় লর্ডসভার আলোচ্যসূচীর পরিমাণ সীমিত থাকায় লর্ডসভার পক্ষে অনেক বেশি সময় নিয়ে কোন বিষয় আলোচনা করা সম্ভব।

(২) **শাসন সংক্রান্ত কাজ ঃ** লর্ডসভার মত একটি অগণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানও কিছু শাসন সংক্রান্ত ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন বিভিন্ন বিলের ওপর আলোচনা, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা, সরকারী নীতির ত্রুটি বিচ্যুতি সম্পর্কে সমালোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে লর্ডসভা শাসনবিভাগকে সংযত রাখার চেষ্টা করে। বিচারপতিদের পদচ্যুত করার ব্যাপারেও লর্ডসভা গুরুত্বপূর্ণ ক্ষমতা ভোগ করে। তবে একথা ঠিক যে বর্তমানে সরকারের ওপর লর্ডসভার কোন ক্ষমতা নেই, কেননা শাসনবিভাগ তার কাজের জন্য লর্ডসভার কাছে নয়, কমন্সসভার কাছেই দায়িত্বশীল থাকে।

(৩) **বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** লর্ডসভার বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই কক্ষ হল ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত। বিশ্বের অন্য কোন দেশের উচ্চ কক্ষকে এই ক্ষমতা দেওয়া হয় নি। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কেবলমাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই কাজে অংশেগ্রহণ করেন। এছাড়াও লর্ডসভার আরও বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতাও আছে। লর্ডসভা কোন ব্যক্তির গুরুতর অপরাধের বিচার করতে পারে যদি কমন্সসভা এই মর্মে কোন অভিযোগ করে। আবার লর্ডসভা লর্ড উপাধিসংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধের মীমাংসা করে। বিচারপতিদের অপসারণ করার ব্যাপারেও লর্ডসভা কমন্সসভার সঙ্গে সমান ক্ষমতাভোগ করে।

(৪) **অন্যান্য ক্ষমতা ঃ** ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হিসেবে লর্ডসভা আরও কিছু ক্ষমতা ভোগ করে। যেমন ঃ

(ক) কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে সম্পর্করক্ষার ক্ষেত্রে এবং পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত বিষয়ে লর্ডসভা কমন্সসভাকে সাহায্য করতে পারে।

(খ) লর্ডসভার অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যের দ্বারা সুচিন্তিত জনমত গঠনে সাহায্য করেন।

লর্ডসভার উপযোগিতা

লর্ডসভার ভূমিকা ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করে বিশেষজ্ঞরা এই কক্ষটির উপযোগিতা বা প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। কেউ কেউ লর্ডসর্ভার পক্ষে যুক্তি দেন, আবার কেউ কেউ লর্ডসভার বিপক্ষে মত প্রকাশ করেন।

লর্ডসভার পক্ষে যুক্তি ঃ

(১) জনগণের কাছে রাজনৈতিক অর্থে দায়িত্বশীল থাকতে হয় না বলে লর্ডসভা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে।

(২) কমন্সসভা অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়নের চেষ্টা করলে লর্ডসভা তার দোষত্রুটি সংশোধন করতে পারে।

(৩) লর্ডসভা প্রচলিত আইন অনুযায়ী প্রণীত ও ঘোষিত বিধিবদ্ধ নিয়মাবলী ও নির্দেশসমূহ (Statutory Rules and Orders) পর্যালোচনা করে। এর ফলে কমন্সসভার দায়িত্বের বোঝা বহুল পরিমাণে লাঘব হয়।

(৪) সাধারণভাবে বেশির ভাগ বেসরকারী বিল লর্ডসভায় উত্থাপিত হয়। লর্ডসভার বিভিন্ন কমিটি এইসব বিল বিস্তৃতভাবে পর্যালোচনা করে। লর্ডসভার অস্তিত্ব না থাকলে এইসব দায়িত্ব কমন্সসভাকেই গ্রহণ করতে হ'ত।

(৫) লর্ডসভার একটা প্রশাসনিক ভূমিকাও আছে। মন্ত্রিসভার সদস্যরা কেবলমাত্র কমন্সসভা থেকেই নিযুক্ত হন না, লর্ডসভা থেকেও বিভিন্ন স্তরে মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়।

(৬) লর্ডসভার অনেক সদস্য অভিজ্ঞতা এবং পারদর্শিতার ফলে সরকারী নীতি সম্পর্কে বিশেষজ্ঞ মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতামতের ভিত্তিতে সরকার নিজ নীতি ও সিদ্ধান্তের ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা দূর করতে পারেন।

(৭) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা লর্ডসভার অস্তিত্বের অন্যতম প্রধান কারণ।

(৮) গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হল লর্ডসভা। এক্ষেত্রেও লর্ডসভা তার নিজের উপযোগিতাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

লর্ডসভার বিপক্ষেও অনেক যুক্তি উত্থাপন করা হয়েছে।

লর্ডসভার বিপক্ষে যুক্তি ঃ

(১) প্রথমত বলা হয় লর্ডসভার গঠন অগণতান্ত্রিক। লর্ডসভা মূলত উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে গঠিত একটি কক্ষ। গণতন্ত্রের সঙ্গে উত্তরাধিকারের নীতির কোন সামঞ্জস্য নেই। লর্ডসভার সদস্যদের পারদর্শিতা কোনওভাবেই প্রতিনিধিত্বের সমার্থক নয়।

(২) লর্ডসভা অতিমাত্রায় রক্ষণশীল। সেই কারণে কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত যে কোনও প্রগতিশীল পদক্ষেপে লর্ডসভা বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

(৩) লর্ডসভার সদস্যদের ব্যাপক সংখ্যায় অনুপস্থিতি ও ঔদাসীন্য এই কক্ষকে অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

(৪) লর্ডসভা যেহেতু বিত্তশালীদের দুর্গ সেহেতু এই কক্ষ এমন সমস্ত কাজ করে যা জাতীয় স্বার্থের পরিপন্থী হিসেবে বিবেচিত হয়।

(৫) কমন্সসভার আইনপ্রণয়ন পদ্ধতি পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণীত হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। ফলে লর্ডসভারও তেমন দরকার নেই।

(৬) আপীল আদালত হিসেবেও লর্ডসভার অস্তিত্ব অপরিহার্য নয়। কারণ সংস্কার আইনের মাধ্যমে

নতুন আদালত গঠন করে সেই আদালতের হাতে সর্বোচ্চ আপীল আদালতের দায়িত্ব ন্যস্ত করা যায়।

লর্ডসভার সংস্কার

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে লর্ডসভার কোনও গুরুত্ব বা প্রয়োজনীয়তা আছে কি না এবং যদি থাকে তাহলে এর সংস্কার দরকার কি না এই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিতর্ক দীর্ঘকালের। বামপন্থী দলগুলি এই সভার বিলোপের পক্ষপাতী। মধ্যপন্থীরা সংস্কারের দ্বারা একে কার্যকরী দ্বিতীয় কক্ষ হিসেবে সংগঠিত করতে আগ্রহী। রক্ষণশীল দল একে অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী।

বস্তুত ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ থেকেই লর্ডসভার সংস্কারসাধনের জন্য বিভিন্ন প্রস্তাব উঠতে থাকে। এইসব প্রস্তাবের মধ্যে উল্লেখযৌগ্য হল ১৮৬৯ সালে লর্ড রাসেল-এর প্রস্তাব, ১৮৭৪ সালে লর্ড রোস্‌বেরির প্রস্তাব এবং ১৮৮৮ সালে লর্ড সলসবেরির প্রস্তাব। কিন্তু এইসব প্রস্তাবের কোনটাই গৃহীত হয় নি। এইসব প্রস্তাবই প্রত্যাখ্যাত হয়।

এরপর ১৯০৭ সালে একটি সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটি গঠনের মূল উদ্দেশ্য ছিল ১৯০৭ সালের আগে লর্ডসভার সংস্কারসাধনের জন্য যেসব প্রস্তাব উত্থাপিত হয়েছিল সেগুলিকে পরীক্ষা করে দেখা। বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করে এই কমিটি লর্ডসভার গঠন সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু সুপারিশ করে। এইসব সুপারিশ বাস্তবায়িত হওয়ার আগেই লর্ডসভা ও কমন্সসভার মধ্যে তীব্র বিরোধ শুরু হয়। এর ফলে সিলেক্ট কমিটির প্রস্তাব চাপা পড়ে যায়।

১৯০৯ সালে লর্ডসভার সংস্কারের বিষয়ে ল্যান্সডাউন পরিকল্পনা প্রত্যাখ্যাত হওয়ার পর ১৯১৭ সালে লর্ড ব্রাইসের সভাপতিত্বে ৩০ জন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়। এই ব্রাইস কমিটি একই সঙ্গে নির্বাচন ও মনোনয়নের ভিত্তিতে লর্ডসভা গঠনের সুপারিশ করে। এই কমিটি লর্ডসভার সদস্যদের কার্যকাল ১২ বছর ধার্য করে। প্রতি ৪ বছর অন্তর এর এক তৃতীয়াংশ সদস্যের অবসর গ্রহণের সুপারিশ করে এবং লর্ডসভার কাজকে কমন্সসভার প্রেরিত বিল পরীক্ষার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে চাইলেও এই কমিটির সুপারিশ রক্ষণশীল বা উদারনৈতিক কোন দল কর্তৃকই সমর্থিত হয়নি।

এরপর ১৯২২ সালে লয়েড জর্জ 'ব্রাইস কমিটির' সুপারিশের ভিত্তিতে পার্লামেন্টে প্রস্তাব উত্থাপন করলেও সরকারের পতনের ফলে এই প্রস্তাব বাস্তব রূপ পায়নি। একইভাবে ১৯২৫ সালে লর্ড ব্রিকেন্‌হেড-এর প্রস্তাব, ১৯২৮ সালে লর্ড ক্লারেন্‌ডন-এর প্রস্তাব, ১৯৩২ সালে রক্ষণশীল দল কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব, ১৯৩৩ সালে লর্ড সলস্‌বেরি কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব, ১৯৩৪ সালে শ্রমিক দল কর্তৃক লর্ডসভার বিলুপ্তির প্রস্তাব প্রস্তাবই থেকে গেছে। মতৈক্যের অভাবে এইসব প্রস্তাবের কোনটাই কার্যকর হয় নি।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শ্রমিক দল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে এট্‌লি নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী এটলির সভাপতিত্বে এইসময় একটি সর্বদলীয়

সম্মেলন হয়। এই সম্মেলনে লর্ডসভার সংস্কার সম্পর্কে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতৈক্যের অভাবে এই সম্মেলন ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

এরপর ১৯৬৪ ও ১৯৬৬ সালের নির্বাচনী ইস্তাহারে শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে লর্ডসভার পুনর্গঠন ও ক্ষমতা হ্রাসের কথা ঘোষণা করা হয়। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৮ সালে সরকার পার্লামেন্টে একটি বিল উত্থাপন করে। কিন্তু কমন্সসভায় শ্রমিক দলের বামপন্থী গোষ্ঠী ও রক্ষণশীল দলের দক্ষিণপন্থীদের বিরোধিতার জন্য এই প্রচেষ্টা সফল হয় নি। ১৯৬৯ সালে প্রস্তাবটি পরিত্যক্ত হয়।

১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত শ্রমিক দলের পক্ষ থেকে লর্ডসভা তুলে দেওয়ার যে দাবি জানানো হয়েছিল, ব্রিটেনের রাজনীতিতে রক্ষণশীল দলের আধিপত্যের ফলে সেই সময় সেই প্রস্তাব কার্যকর করা সম্ভব হয় নি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য শ্রমিক দল তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে এবং লর্ডসভার বিলুপ্তির পরিবর্তে সংস্কারসাধনের কমসূচী এই দলের পক্ষ থেকে গ্রহণ করা হয়।

১৯৮২ সাল নাগাদ সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির পক্ষ থেকে একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে লর্ডসভার সংস্কারের একটি কর্মসূচী উত্থাপন করা হয়। এরপর ১৯৯১ সালে ইনস্টিটিউট অব্ পাবলিক পলিসি রিসার্চ - এর তরফ থেকে নির্বাচিত দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়। ঐ একই সালে ইনিবেন যে প্রস্তাব উত্থাপন করেন তাতে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে দ্বিতীয় কক্ষ গঠনের সুপারিশ করা হয়।

এখন স্বাভাবিকভাবেই এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে লর্ডসভার সংস্কারের এইসব প্রস্তাব কার্যকর না হওয়ার কারণ কি? এর মূল কারণ হল ঃ

(১) গ্রেট ব্রিটেনের রাজনীতিতে রক্ষণশীল দলের আধিপত্য লর্ডসভার গঠন ও ক্ষমতা অপরিবর্তিত থাকার একটি উল্লেখযোগ্য কারণ।

(২) যাঁরা লর্ডসভার সংস্কারের পক্ষপাতী তাঁদের মধ্যে ঐকমত্যের অভাব ও দ্বিতীয় কক্ষ বা অগণতান্ত্রিক কক্ষ হিসেবে লর্ডসভার স্থায়িত্ব একটি অন্যতম কারণ।

(৩) লর্ডসভার বিলুপ্তির পর কিভাবে এই দ্বিতীয় কক্ষের গঠন ও ক্ষমতার পুনর্বিন্যাস করা হবে সে সম্পর্কে মতৈক্যের অভাবও লর্ডসভার অস্তিত্বকে টিকিয়ে রেখেছে।

অনুশীলনী — ১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) লর্ডসভা বিশ্বের বৃহত্তম দ্বিতীয় কক্ষ।

(খ) লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত।

(গ) লর্ডসভার গঠন গণতান্ত্রিক।

২। **নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দিন ঃ** (৩/৪টি বাক্যে উত্তর লিখুন।)

(ক) ব্রিটেনের লর্ডসভা কি কি ক্ষমতা ভোগ করে?

(খ) ব্রিটেনের লর্ডসভার বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি দিন।

(গ) লর্ডসভার অস্তিত্বের সপক্ষে তিনটি যুক্তি দিন।

(ঘ) অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভার ক্ষমতা কিরূপ?

(ঙ) ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত কোন্‌টি?

৯৯.৩.২ কমন্সসভা

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ বা দ্বিতীয় কক্ষের নাম কমন্সসভা। এই কমন্সসভা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত একটি কক্ষ। গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমন্সসভার উদ্ভব ও বিকাশ খুব বেশি দিনের ঘটনা নয়। ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে রাজার ক্ষমতার পরিবর্তে উদারনৈতিক গণতন্ত্রের ক্রমবিকাশ শুরু হয়। ব্রিটেনের ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ সালের সংস্কার আইনগুলির (Reform Act) ভিত্তিতে জনগণের প্রতিনিধি নির্বাচনের ব্যবস্থা গণতন্ত্রসম্মত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গৃহীত হয়। আগে সম্পত্তিগত যোগ্যতার ভিত্তিতে কমন্সসভার সদস্য হওয়ার ব্যবস্থা চালু ছিল। ১৮৫৮ সালে এই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা বাতিল করা হয়। প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষদের ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় ১৯১৮ সালে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের মাধ্যমে। প্রাপ্তবয়স্ক স্ত্রীলোকের ভোটের অধিকার স্বীকৃত হয় ১৯২৮ সালে। ব্রিটেনে একাধিক ভোটাধিকারের ব্যবস্থা দীর্ঘদিন প্রচলিত ছিল। এই ব্যবস্থা বাতিল হয় ১৯৪৮ সালে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক আইনের মাধ্যমে। জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের ১৯৬৯ সালের সংশোধন অনুসারে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেক নাগরিকের ক্ষেত্রেই সার্বজনীন ভোটাধিকারের নীতি প্রযোজ্য।

কমন্সসভার গঠন

কমন্সসভা হল জনপ্রতিনিধি সভা। ১৯৬৯ সালের সংশোধিত জনপ্রতিনিধিত্ব আইন অনুসারে এখন ১৮ বছর বয়স্ক প্রত্যেক ব্রিটিশ প্রজা কমন্সসভার প্রতিনিধি নির্বাচনে ভোটদানের অধিকারী। ব্রিটেনে বসবাসকারী কমনওয়েলথ ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের নাগরিকগণ প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন। বিদেশী, উন্মাদ, দেউলিয়া এবং চুরি ও বিশ্বাসঘাতকতার জন্য দণ্ডপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের ভোটাধিকার নেই। প্রত্যেক ভোটদাতা একটি ভোট দিতে পারেন।

কমন্সসভার সদস্যসংখ্যা বর্তমানে ৬৩৫ থেকে বাড়িয়ে ৬৫০ করা হয়েছে। এই পরিবর্তন ১৯৮৩ সালেব নির্বাচন থেকে কার্যকর হয়েছে। কমন্সসভার সদস্যপদ প্রার্থী'কে (১) অন্তত ২১ বছর বয়স্ক হতে হবে; (২) জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সিদ্ধ ব্রিটিশ প্রজা হতে হবে; (৩) যে কোন ধর্মবিশ্বাস বা অবিশ্বাসের

সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ সাধারণ আনুগত্যের শপথ নিতে হবে। ১৯৫৭ সালের কমন্সসভা অযোগ্যতা আইন অনুসারে উন্মাদ, দেউলিয়া, দুর্নীতিসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কাজের ফলে দণ্ডিত ব্যক্তি, ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের চার্চের যাজক, রোমান ক্যাথলিক চার্চের পুরোহিত, সরকারী কর্মচারী, সামরিক ও পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণ ইংল্যাণ্ড ও স্কটল্যাণ্ডের পিয়ারগণ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারেন না। ১৯৬৩ সালের পিয়ারেজ আইন অনুসারে উত্তরাধিকারসূত্রে লর্ডসভার সদস্য কোন ব্যক্তি লর্ড উপাধি পরিত্যাগ করে কমন্সসভার সদস্যপদের জন্য নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। ১৭০৫ সালের রাজকর্মচারী আইন অনুসারে রাজার অধীনে অর্থকরী পদে নিযুক্ত ব্যক্তি কমন্সসভার সদস্য হতে পারেন না বা থাকতে পারেন না।

কমন্সসভার সদস্য সংখ্যা অনুসারে সমগ্র দেশকে ভৌগলিক নির্বাচনী এলাকায় বিভক্ত করা হয়। প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকা থেকে একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন।

১৯১১ সালে পার্লামেন্ট আইন প্রণীত হওয়ার পর থেকে কমন্সসভার স্বাভাবিক কার্যকাল হল পাঁচ বছর। তবে যুদ্ধ বা কোনও জরুরী অবস্থায় এই কার্যকাল বৃদ্ধি করা যায়। আবার পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই কমন্সসভাকে ভেঙ্গে দেওয়ার ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী রাজা বা রানীকে পরামর্শ দিতে পারেন। দলে ভাঙ্গন অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠতা হ্রাসের দরুন সরকারের স্থিতিশীলতায় আশঙ্কিত হলে প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভা ভেঙ্গে দিয়ে জনম যাচাই-এর ব্যবস্থা করতে পারেন। ১৯৭৯ সালে শ্রমিকদলের প্রধানমন্ত্রী জেমস কালাঘান এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন।

শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসারে বর্তমানে কমন্সসভার অধিবেশন বছরে অন্ততঃ একবার ডাকতেই হয়। তবে জরুরী অবস্থায় বা কোন বিশেষ প্রয়োজনে বিশেষ অধিবেশন ডাকা যেতে পারে। পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন রাজা বা রানী।

কমন্সসভার সদস্যদের নানা ধরনের আর্থিক সুযোগ সুবিধাদানের ব্যবস্থা আছে। ১৯৭২ সালের মন্ত্রী ও অন্যান্য পদাধিকারীদের বেতন সম্পর্কিত আইন অনুসারে কমন্সসভার সদস্যদের বেতন ও ভাতা নির্ধারিত হয়। সভার প্রত্যেক সদস্য করযোগ্য বাৎসরিক বেতন হিসেবে ৪৫০০ পাউন্ড পান। এছাড়াও প্রত্যেক সদস্য বছরে করমুক্ত ১০৫০ পাউন্ড যাতায়াত, টেলিফোন, চিঠিপত্রের আদানপ্রদান জনিত ভাতা এবং অবসরকালীন ভাতার সুবিধা ভোগ করেন।

কমন্সসভায় একজন সভাপতি থাকেন। তাঁকে পীকার বলা হয়। স্পীকার বাদে কমন্সসভার অন্যান্য কর্মচারীরা হলেন একজন ক্লার্ক ও তাঁর দু'জন সহকারী, সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মস ও তাঁর সহকারীগণ, চ্যাপলেন, স্পীকারের আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা এবং লয়েজ এন্ড মিনস্ কমিটির সভাপতি ও সহ-সভাপতি। স্পীকার চ্যাপলেনকে নিযুক্ত করেন। সভার শুরুতে চ্যাপলেন বাইবেলপাঠ ও প্রার্থনা করেন। কমন্সসভার সদস্যরাই কমিটিগুলির সভাপতি ও সহ-সভাপতিদের নির্বাচিত করেন। সভাপতিরা কমিটির কাজকর্ম পরিচালনা করেন। ক্লার্ক এবং সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মস ও তাঁদের সহকারীরা

রাজা বা রানী কর্তৃক নিযুক্ত হন। তবে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা বা রানী এই নিয়োগকার্য সম্পাদন করেন। সার্জেন্ট-অ্যাট-আর্মস-এর দায়িত্ব হল সভায় শান্তি শৃংখলা সংরক্ষণের ব্যাপারে স্পীকারকে সাহায্য করা। ক্লার্ক ও তাঁর দু'জন সহকারী কমন্সসভার কার্যবিবরণী রেকর্ড করা, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সংরক্ষণ প্রভৃতি দায়িত্ব পালন করেন।

কমন্সসভার কার্যাবলী

কমন্সসভার ক্ষমতা ও কার্যাবলীকে মোটামুটি নয় ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) **আইন প্রণয়ন ঃ** আইন প্রণয়নই হল কমন্সসভার প্রধান কাজ। কমন্সসভা ব্রিটেন ও তার উপনিবেশগুলির জন্য দরকারী যে কোনও আইন রচনা করতে পারে। তাছাড়া প্রচলিত যে কোনও আইনকে পরিবর্তন বা বাতিল করতে পারে। আইনতঃ ব্রিটিশ পার্লামেন্ট হল একটি সার্বভৌম আইন প্রণয়নকারী সংস্থা। এখানে পার্লামেন্টের ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়। বাস্তবে গুরুত্বপূর্ণ সব বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়। কেবল অবিতর্কিত বিলগুলিই লর্ডসভায় উত্থাপিত হয়। কমন্সসভা হ'ল জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ। তাই গুরুত্বপূর্ণ যাবতীয় বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয়। অর্থবিল প্রথম কমন্সসভায় পেশ করতে হয়। তা ছাড়া কমন্সসভায় বেসরকারী বিল নিয়েও আলোচনা হয় এবং সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট আইনের পর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভার তুলনায় কমন্সসভা অনেক বেশী ক্ষমতা ভোগ করে। লর্ডসভা কমন্সসভা কর্তৃক প্রণীত সাধারণ বিলকে এক বছরের মত বাধা দিতে পারে মাত্র। তারপর লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই রাজা বা রানীর স্বাক্ষর সমেত বিলটি আইনে পরিণত হয়।

কিন্তু বাস্তবে ব্রিটিনের আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে ক্যাবিনেটের ভূমিকাই গুরুত্বপূর্ণ। সংসদীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে মূল কর্তৃত্ব কমন্সসভা থেকে ক্যাবিনেটের হাতে চলে এসেছে।

(২) **সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ ঃ** কমন্সসভার আর একটি উল্লেখযোগ্য দায়িত্ব হল সরকারী আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণ। প্রত্যেক আর্থিক বছরের শেষে রানীর পূর্বানুমতি নিয়ে অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় পরবর্তী আর্থিক বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয়ের হিসেব সম্পর্কে প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাব বাজেট প্রস্তাব নামে পরিচিত। এই বাজেটের মাধ্যমেই সরকারের আর্থিক নীতি প্রতিফলিত হয়। কমন্সসভার অনুমতি ছাড়া সরকার কোন কর ধার্য, করের হার পরিবর্তন, করবিলোপ এবং বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে না। গ্রেট ব্রিটেনের সঞ্চিত তহবিল থেকে কোনও অর্থ ব্যয়ের প্রয়োজন হলেও সরকারকে কমন্সসভার অনুমতি নিতে হয়। আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটি (Estimates Committee), বর্তমানে যার নাম ব্যয়কমিটি (The Expenditure Committee) সরকারী হিসাব কমিটি (Public Accounts Committee), নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (Comptroller and Auditor-General)-এর প্রতিবেদন আলোচনার মাধ্যমেও কমন্সসভা সরকারের আয়-ব্যয়ের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। কমন্সসভা কর্তৃক

গৃহীত বাজেট লর্ডসভা প্রত্যাখ্যান করতে পারে না, কেবল একমাস বিলম্বিত করার ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। তবে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অর্থসংক্রান্ত বিষয়েও ক্যাবিনেটের হাতেই চূড়ান্ত ক্ষমতা বর্তমান। কমন্সসভার ভূমিকা আনুষ্ঠানিক মাত্র।

(৩) **সরকার গঠন ঃ** প্রত্যেক সাধারণ নির্বাচনের পর কমন্সসভার প্রাথমিক কর্তব্য হল সরকার গঠনে সাহায্য করা। কমন্সসভায় নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার অধিকারী দলের নেতা বা নেত্রীকেই রানী প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। প্রচলিত সাংবিধানিক রীতিনীতি অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী কমন্সসভার সদস্য হবেন। লর্ডসভায় কোন দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার ওপর মন্ত্রিসভার গঠন নির্ভরশীল নয়। অর্থাৎ ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা গঠনের ক্ষেত্রে কমন্সসভার ভূমিকাই প্রধান।

(৪) **সরকারকে নিয়ন্ত্রণ ঃ** সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতি অনুসারে ব্রিটেনের মন্ত্রিসভা কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল। মন্ত্রিগণ তাঁদের কাজকর্মের জন্য ব্যক্তিগতভাবে এবং যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়ী থাকেন। কমন্সসভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য যতদিন মন্ত্রিসভাকে সমর্থন করেন মন্ত্রিসভা ততদিন ক্ষমতাসীন থাকে। কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া কমন্সসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান এবং মুলতুবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, ছাঁটাই প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি উত্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অনেকের মতে বর্তমানে ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কার্যত ক্যাবিনেটই কমন্সসভাকে নিয়ন্ত্রণ করে। তবে সাম্প্রতিক কালে সরকার ও কমন্সসভার মধ্যে ক্ষমতার নতুন ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য কমন্সসভার সদস্যরা কিছুটা সক্রিয় হয়ে উঠেছেন।

(৫) **অর্থবিল সংক্রান্ত ক্ষমতা ঃ** অর্থবিল প্রথমে কমন্সসভায় উত্থাপিত হয়। রানীর পূর্বসম্মতি নিয়ে সাধারণতঃ অর্থমন্ত্রী কমন্সসভায় অর্থবিল উত্থাপন করেন। কমন্সসভা কর্তৃক অর্থবিল গৃহীত হবার পর ঐ বিল লর্ডসভার অনুমোদনের জন্য প্রেরিত হয়। লর্ডসভা কোন অর্থবিল প্রত্যাখ্যান করতে পারে না। কমন্সসভা কর্তৃক গৃহীত বিল অনুমোদন করতে পারে বা কোনও সংশোধন সুপারিশ করতে পারে। কিন্তু ঐ সুপারিশ গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করা কমন্সসভার বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের ওপর নির্ভরশীল। কমন্সসভা কর্তৃক প্রেরিত বিল লর্ডসভা এক মাসের জন্য বিলম্বিত করতে পারে। তাছাড়া কোনও বিল অর্থবিল কি না এই বিষয়ে কোন সন্দেহ দেখা দিলে কমন্সসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কোনও অর্থবিল যখন রানীর সম্মতির জন্য প্রেরিত হয় তখন কমন্সসভার স্পীকারকে সার্টিফিকেট দিতে হয় যে, ঐ বিল অর্থবিল।

(৬) **সংবিধান সংশোধনের ক্ষমতা ঃ** কমন্সসভা আইন এবং সংবিধান সংশোধনেও অংশগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে লর্ডসভা এবং কমন্সসভার ক্ষমতা সমান। গ্রেট ব্রিটেনের সংবিধান অত্যন্ত নমনীয়। এখানে সাধারণ আইন প্রণয়ন, আইন সংশোধন এবং সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন পদ্ধতির

মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। সুতরাং যে পদ্ধতিতে সাধারণ আইন প্রণীত ও সংশোধিত হয় সেই একই পদ্ধতিতে কমন্সসভা সাংবিধানিক আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করতে পারে। কমন্সসভায় উপস্থিত এবং ভোটদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের সমর্থনে যেভাবে কোন সাধারণ বিল অনুমোদিত হয়, সেই একইভাবে সংবিধান সংশোধন বা পরিবর্তন করা যায়।

(৭) **জনমত গঠন ঃ** জনমত গঠনের ব্যাপারে কমন্সসভার ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। কমন্সসভা সরকারী নীতি ও মন্ত্রিসভার কাজকর্মের ওপর সদা সতর্ক দৃষ্টি রাখে। সভা জনগণকে সরকারের গতিবিধি সম্পর্কে অবহিত রাখে এবং সতর্ক করে দেয়। কমন্সসভার বিতর্কের মাধ্যমে জনগণ শাসন ব্যাপারে সরকারী ও সরকার বিরোধী মতামত ও যুক্তিতর্ক জানতে পারে এবং জনমত গঠিত হয়।

(৮) **সংবাদ ও তথ্য সরবরাহ ঃ** কমন্সসভায় আলোচিত ও বিতর্কিত বিষয়গুলির তথ্য সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন প্রভৃতির মাধ্যমে জনগণের কাছে পৌঁছায়। তার ফলে জনসাধারণ সরকারের কার্যকলাপ সম্পর্কে সঠিক সংবাদ ও তথ্য জানবার সুযোগ পায়।

(৯) **জনগণ ও সরকারের মধ্যে সংযোগ বিধান ঃ** কমন্সসভার সদস্যরা নির্বাচকমন্ডলীর মনোভাব কমন্সসভায় ও সরকারের কাছে পেশ করেন। আবার অন্যদিকে সরকারের বক্তব্য জনসাধারণের কাছে পেশ করেন। কমন্সসভার সদস্যগণ নিজ নিজ নির্বাচনী কেন্দ্রের সঙ্গে ব্যক্তিগতভাবে সংযোগ রক্ষা করেন। এইভাবে কমন্সসভা সরকার ও জনগণের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কমন্সসভা পৃথিবীর একটি অন্যতম প্রভাবশালী বিতর্কমঞ্চ এবং একটি উল্লেখযোগ্য আলোচনা সভা। কমন্সসভা সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের আমলাদের কাজকর্মের সমালোচনার মাধ্যমে ব্রিটিশ আমলাতন্ত্রকেও নিয়ন্ত্রণ করে। আবার ব্রিটেনের স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীগুলির স্বার্থরক্ষামূলক কাজকর্মের সঙ্গেও কমন্সসভার যোগাযোগ থাকে। বস্তুত ব্রিটিশ কমন্সসভা ব্রিটেনের রাজনৈতিক সংস্কৃতির প্রতিনিধি হিসাবে প্রতিপন্ন হয়। তবে বর্তমানে ব্রিটিশ ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাস্তবে কমন্সসভার ক্ষমতা ও মর্যাদা অনেক হ্রাস পেয়েছে।

অনুশীলনী — ১

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। ব্রিটিশ কমন্সসভার কার্যকালের মেয়াদ ---------- বছর।

২। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ---------- কক্ষে অর্থবিল প্রথম উত্থাপিত হয়।

৩। কোন বিল অর্থ বিল কি না সে সম্পর্কে ---------- এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

৪। আনুমানিক ব্যয় হিসাব কমিটির বর্তমান নাম ---------- কমিটি।

স্পীকার (অধ্যক্ষ)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভার সভাপতিকে স্পীকার বলা হয়। কমন্সসভার সভাপতি হিসেবে স্পীকারের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই পদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেই পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্পীকারের ক্ষমতা, কার্যাবলী ও পদমর্যাদার বিন্যাস করা হয়েছে। পূর্বে কমন্সসভার স্পীকার রাজা বা রানী কর্তৃক নিযুক্ত হতেন এবং রাজা বা রানীর ইচ্ছায় কমন্সসভার কার্য পরিচালনা করতেন। এছাড়াও সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ব্যাপারেও স্পীকারের কোনরকম বাধা ছিল না। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও অনেকদিন পর্যন্ত স্পীকারকে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে দেখা গেছে। কিন্তু পরবর্তী সময় থেকেই স্পীকারের পদটির সঙ্গে রাজনীতি নিরপেক্ষতা বিষয়টি যুক্ত হয়েছে।

কমন্সসভার নির্বাচনের পর কমন্সসভার প্রথম অধিবেশনে সভার সদস্যগণ নিজেদের মধ্যে থেকে সভার কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একজনকে স্পীকার বা সভাপতি হিসাবে নির্বাচিত করেন। অতীতে কয়েকবার স্পীকারের পদে নির্বাচন হলেও বর্তমানে ক্ষমতাসীন ও বিরোধী দলের পারস্পরিক বোঝাপড়ার ভিত্তিতেই স্পীকার নির্বাচন করা হয়। তাছাড়াও প্রাক্তন স্পীকার পুনরায় স্পীকার পদে নির্বাচিত হতে চাইলে তাঁকে ঐ পদে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি কমন্সসভার নির্বাচনে যে কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন, সেই কেন্দ্রে অন্য কোনও প্রার্থী দেওয়া হয় না। কমন্সসভার কার্যকাল ৫ বছর হওয়ার জন্য স্পীকারও ৫ বছর তাঁর পদে বহাল থাকেন। অবশ্য কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে পারেন, আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি পদচ্যুতও হতে পারেন।

স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

স্পীকার হলেন কমন্সসভার সভাপতি। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা বজায় রেখে স্পীকারকে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাঁর ক্ষমতা ও কার্যাবলীর উৎসসমূহ হল সভার স্থায়ী নিয়মাবলী, প্রচলিত প্রথা এবং কতকগুলি লিখিত আইন।

স্পীকারের ক্ষমতা ও কার্যাবলী হল নিম্নরূপ ঃ

(১) **কমন্সসভার শান্তি শৃংখলা রক্ষা করা ঃ** স্পীকারের অন্যতম প্রধান কাজ হল কমন্সসভার আলোচনা ও বিতর্ক চলাকালীন কোন সদস্য অশালীন মন্তব্য করলে বা আপত্তিকর আলোচনা করলে স্বীকার সেই সদস্যকে কমন্সসভা থেকে বহিষ্কারের নির্দেশ দিতে পারেন। প্রয়োজন মনে করলে তিনি কমন্সসভার অধিবেশন সাময়িকভাবে মুলতুবী রাখতে পারেন।

(২) **কমন্সসভার কাজ পরিচালনা করা ঃ** কমন্সসভার কার্য পরিচালনার গুরুদায়িত্ব স্পীকারের ওপর ন্যস্ত থাকে। কোন বিষয়ে আলোচনায় বা বিতর্কে কোন্ কোন্ সদস্য অংশগ্রহণ করবেন, কোন কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যাবে, কোন সংশোধনী প্রস্তাব বৈধ কি না প্রভৃতি বিষয়ে স্পীকারকেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। তবে তিনি নিজে বিতর্কে বা আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন না। তিনি কোনও

প্রস্তাবের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোট দেন না। তবে যদি কোনও প্রস্তাবের পক্ষে ও বিপক্ষে ভোটের সংখ্যা সমান দেখা যায়, সেক্ষেত্রে তিনি একটি নির্ণায়ক ভোট দিতে পারেন।

(৩) **অর্থবিল সম্পর্কিত সিদ্ধান্তগ্রহণ করা ঃ** ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইনে অর্থবিলের সংজ্ঞা দেওয়া হলেও কোন বিল অর্থবিল কি না সে সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দিলে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে গণ্য হয়।

(৪) **কমন্সসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষা ঃ** কমন্সসভার সদস্যদের অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে স্পীকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। এই অধিকার যাতে সদস্যরা ভোগ করতে পারেন সেই ব্যাপারে স্পীকারকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হয় এবং অধিকার ভঙ্গের অভিযোগ নির্দিষ্ট কমিটির মাধ্যমে বিবেচনার সুযোগ দিতে হয়।

(৫) **কমন্সসভা ও রাজশক্তির মধ্যে যোগসূত্র রক্ষা করা ঃ** স্পীকার কমন্সসভার সঙ্গে রাজশক্তির যোগাযোগ রক্ষার মাধ্যম হিসেবে কাজ করেন। কমন্সসভার কোন বক্তব্য রাজা বা রানীর কাছে পেশ করার থাকলে, আবার রাজা বা রানীর কোন বক্তব্য কমন্সসভার কাছে উপস্থিত করার থাকলে তা স্পীকারের মাধ্যমে সম্পাদিত হয়।

(৬) **কমন্সসভার নিয়মবিধি ব্যাখ্যা করা ঃ** কমন্সসভায় কোন বিষয়ে বৈধতার প্রশ্ন উঠলে বা কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি সম্পর্কিত নিয়মকানুন নিয়ে প্রশ্ন উঠলে স্পীকারই এই ব্যাপারে যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। স্পীকারের নির্দেশের বৈধতা বিচারের ক্ষমতা আদালতের নেই।

(৭) **বিভাগীয় মন্ত্রীদের সমালোচনা করা ঃ** কমন্সসভার সদস্যরা কোন মন্ত্রীর কাছে বিভাগীয় তথ্য ও বক্তব্য দাবি করতে পারেন। সেক্ষেত্রে স্পীকার সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সদস্যদের দাবি অনুসারে তথ্য ও বক্তব্য পেশ করতে বাধ্য করতে পারেন। আবার মন্ত্রীদের কার্য কলাপে অসন্তুষ্ট হলে তিনি কোন মন্ত্রী বা মন্ত্রীদের সমালোচনা করতে পারেন।

(৮) **অন্যান্য কাজ ঃ** স্পীকার আরও কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেন। যেমন —

(ক) কোন্ প্রস্তাব কোন্ কমিটির কাছে বিচার বিবেচনার জন্য পাঠানো হবে তা স্পীকার ঠিক করেন।

(খ) কমন্সসভার অধিকার ভঙ্গের জন্য স্পীকার কোন বহিরাগতকে শাস্তি দিতে পারেন।

(গ) পার্লামেন্টের বাইরে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে স্পীকার কমন্সসভার প্রতিনিধিত্ব করেন।

(ঘ) বিরোধী নেতা নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিরোধ দেখা দিলে স্পীকার তার মীমাংসা করেন।

(ঙ) সরকারি দলের হাত থেকে বিরোধীদের অধিকার রক্ষার দায়িত্ব স্পীকারের।

পরিশেষে বলা যায় যে স্পীকার পদটি ব্রিটেনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডাইসির মতানুসারে স্পীকারের

পদটিই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের সঠিক স্বরূপ যথাযথভাবে প্রকাশ করে। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতাই স্পীকারের পদটিকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেছে। তবে চূড়ান্ত বিচারে পদাধিকারীর গুণগত যোগ্যতা, বিচক্ষণতা, ব্যক্তিত্ব প্রভৃতি গুণাবলীর ওপর স্পীকার পদের মর্যাদা বহুলাংশে নির্ভরশীল।

অনুশীলনী — ৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। ---------- ---------- স্পীকারের পদটিকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

২। স্পীকার হলেন কমন্সসভার ----------।

লর্ডসভা ও কমন্সসভার মধ্যে সাংবিধানিক সম্পর্ক

গ্রেট ব্রিটেনের আইনসভা বলতে রাজা বা রানীসহ পার্লামেন্টকে বোঝায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। এর উচ্চকক্ষের নাম লর্ডসভা এবং নিম্নকক্ষের নাম কমন্সসভা। গণতান্ত্রিক আদর্শের বিকাশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে উভয়কক্ষের শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক সম্পূর্ণ নতুন রূপ লাভ করেছে। একদিকে যেমন লর্ডসভার ক্ষমতা ও প্রভাব হ্রাস করা হয়েছে, অন্যদিকে কমন্সসভার ক্ষমতা ও প্রভাব প্রসারিত হয়েছে। উভয় কক্ষের গঠন ও প্রকৃতি পর্যালোচনা করলেই জনপ্রতিনিধিমূলক কক্ষ হিসাবে কমন্সসভার ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধির কারণ অনুধাবন করা যাবে।

(১) **গঠনগত পার্থক্য ঃ** কমন্সসভার সদস্যগণ সর্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কের ভোটের ভিত্তিতে নির্বাচিত। ১৮ বছর বয়স্ক নাগরিক সাধারণ নির্বাচনে ভোট দিতে পারে। ২১ বছর বয়স্ক নাগরিক নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারে। কমন্সসভা হল তত্ত্বগতভাবে সমাজের ব্যাপক অংশের প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ। অন্যদিকে লর্ডসভা প্রধানতঃ উত্তরাধিকার সূত্রে লর্ডসভার সদস্যপদপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ধর্মীয় লর্ড এবং ১৯৫৮ সালের পিয়ার আইন অনুযায়ী আজীবন লর্ডসভার সদস্যপদে মনোনীত ব্যক্তিদের নিয়ে লর্ডসভা গঠিত। সুতরাং লর্ডসভার গঠনব্যবস্থা প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্রের বিরোধী এবং সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার পরিপোষক।

(২) **কার্যকালগত পার্থক্য ঃ** লর্ডসভা হল একটি স্থায়ী কক্ষ। এই কক্ষের সদস্যরা আজীবন লর্ডসভার সদস্য থাকতে পারেন। জনসাধারণের কাছে এঁদের কোন দায়দায়িত্ব নেই। অন্যদিকে কমন্সসভার মেয়াদ পাঁচ বছর। আবার এই পাঁচ বছরের মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার আগেই প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে রাজা বা রানী কমন্সসভা ভেঙ্গে দিতে পারে। এবং নতুন সাধারণ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে পারেন। তাছাড়া নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে কমন্সসভার সদস্যদের দায়িত্বশীল থাকতে হয়। আইন প্রণীত হওয়ার পর আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে লর্ডসভার ক্ষমতা অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়েছে। বর্তমানে লর্ডসভা সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে এক বছর এবং অর্থবিলের ক্ষেত্রে ১ মাস বিলম্ব ঘটাতে পারে। ফলে এখন ব্রিটিশ সংসদীয় শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা কমন্সসভাই ভোগ করে।

(৬) **আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** আয়-ব্যয়ের ক্ষেত্রে পার্লামেন্টের যে নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রেট ব্রিটেনে রয়েছে তা মূলত কমন্সসভাই ভোগ করে। সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে।

(৭) **অভিযোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রে উভয়ের পার্থক্য ঃ** অভিযোগের প্রতিকারের ক্ষেত্রেও গ্রেট ব্রিটেনের দুই কক্ষের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। বস্তুতঃ কমন্সসভা যেভাবে শাসনবিভাগের বিরুদ্ধে জনগণের কোন অভিযোগের প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে পারে, লর্ডসভার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

(৮) **বিতর্কের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** গ্রেট ব্রিটেনের কমন্সসভাই হল সংসদের তর্কবিতর্ক ও আলোচনার প্রধান কেন্দ্র। রাজা বা রানীর প্রেরিত বাণী থেকে শুরু করে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বা আন্তর্জাতিক প্রশ্ন নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক কমন্সসভাতেই অনুষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে লর্ডসভায় যেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা হয় তা অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ।

(৯) **তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ হিসেবে কমন্সসভায় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিষয় নিয়ে আলোচিত হয় এবং অনেক তথ্য ও সংবাদ প্রকাশিত হয়। আবার বিরোধী দলও তথ্য ও পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সরকারের ভুল-ত্রুটি তুলে ধরার চেষ্টা করে। কিন্তু লর্ডসভার ভূমিকা এ ব্যাপারে খুবই সীমাবদ্ধ।

(১০) **বিরোধী দলের ভূমিকার ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** পার্লামেন্টিয় ব্যবস্থার অন্যতম ভিত্তি হল বিরোধী দলের অস্তিত্ব। বিরোধী দল ছাড়া সংসদীয় গণতন্ত্র অচল। তবে গ্রেট ব্রিটেনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব ও উদ্যোগ কমন্সসভার ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা যায়। লর্ডসভার ক্ষেত্রে নয়।

(১১) **বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ঃ** বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্রেও উভয় কক্ষের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। এই একটি ক্ষেত্রে লর্ডসভা কমন্সসভার থেকে অধিক ক্ষমতা ভোগ করে। লর্ডসভা গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপিল আদালত।

অতএব সামগ্রিক বিচারে কমন্সসভা লর্ডসভা অপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষমতার অধিকারী হলেও কতকগুলি ক্ষেত্রে উভয় কক্ষ সমান ক্ষমতা ভোগ করে। একটি মাত্র ক্ষেত্রে লর্ডসভা কমন্সসভার থেকে বেশী ক্ষমতা ভোগ করে তা হল বিচারসংক্রান্ত ক্ষেত্র। পরিশেষে বলা যায় যে গণতান্ত্রিক ধ্যানধারণার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে গ্রেট ব্রিটেনে সামন্ততান্ত্রিক রক্ষণশীলতা ও কায়েমী স্বার্থের প্রতিভূ লর্ডসভার ক্ষমতা কমলেও গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে কমন্সসভার ক্ষমতা বেড়েছে।

অনুশীলনী — ৪

১। **ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ** (☑ বা ☒ ব্যবহার করুন)

(ক) কমন্সসভা একটি স্থায়ী কক্ষ।

(খ) ব্রিটেনে বিরোধী দলের অস্তিত্ব কমন্সসভার ক্ষেত্রেই প্রত্যক্ষ করা যায়।

(গ) লর্ডসভার কোন বিচার সংক্রান্ত ক্ষমতা নেই।

(ঘ) আয়ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে কমন্সসভাই শক্তিশালী।

(ঙ) সাধারণ বিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা এক বছর বিলম্ব ঘটাতে পারে।

রাজা বা রানীর বিরোধী দল

গ্রেট ব্রিটেনে সাধারণ নির্বাচনে যে দল কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দল সরকার গঠন করে। এই সরকারকে বলা হয় 'রাজা বা রানীর সরকার' (His or Her Majesty's Government)। আর আসন সংখ্যার ভিত্তিতে যে দল সরকারী দলের পরেই দ্বিতীয় স্থান লাভ করে তাকে বিরোধী দল বলা হয়। এই বিরোধী দলকে বলা হয় 'রাজা বা রানীর বিরোধী দল' (His or Her Majesty's Opposition)। বিরোধী দলের এই নামকরণের মাধ্যমে তার অসীম গুরুত্বের প্রতি স্বীকৃতি জ্ঞাপন করা হয়েছে। ১৯৩৭ সালে 'রাজমন্ত্রী আইন' (Ministers of the Crown Act, 1937)-এ প্রধানমন্ত্রীর বেতনের কথা যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি বিরোধী দলের নেতাকেও বেতন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। বর্তমানে বিরোধী দল দায়িত্বশীল, গঠনমূলক এক বিশিষ্ট ভূমিকায় অবতীর্ণ। অধ্যাপক জেনিংস-এর মতানুসারে সমালোচনা করা যদি পার্লামেন্টের মূল কাজ হয়, তা হলে বিরোধী দল পার্লামেন্টের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। বস্তুত একটি প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের কার্যাবলীকে সঠিকভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে একটি সুসংগঠিত ও শক্তিশালী বিরোধী দল অপরিহার্য।

শাসনতান্ত্রিক স্বীকৃতির পরিপ্রেক্ষিতে কমন্সসভায় স্পীকার বিরোধী দলের সদস্যদের আসন বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেন। স্পীকারের ডানদিকে বসেন ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা এবং বাঁদিকে বসেন বিরোধী দলের সদস্যরা। ডানদিকে একেবারে প্রথম সারিতে থাকেন শাসক দলের মন্ত্রীরা অর্থাৎ 'রাজা বা রানীর সরকার', বাঁদিকে একেবারে প্রথম সারিতে থাকেন বিরোধী দলের নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ 'রাজা বা রানীর বিকল্প সরকার' যা এর আগের অধ্যায়ে 'ছায়া মন্ত্রিপরিষদ' নামে উল্লিখিত হয়েছে (৯৮.৪.৯ ক অংশ দ্রষ্টব্য)।

বিরোধী দলের ক্ষমতা ও কার্যাবলী ঃ

ব্রিটেনে বিরোধী দলের কার্যাবলীকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) সরকারের সমালোচনা করাই বিরোধী দলের প্রধান কাজ। এই সমালোচনা থেকে জনগণ সরকারের কাজকর্ম সম্পর্কে সবদিক থেকে অবহিত হতে পারে। বিরোধী দলের সমালোচনার জন্য সরকার দায়িত্বশীল থাকতে বাধ্য হয়। স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে পারে না।

(২) পার্লামেন্টের কাজকর্মে বিরোধী দল অংশগ্রহণ করে। পার্লামেন্টের কার্যসূচী বিরোধী দলের

নেতার সঙ্গে আলোচনাক্রমে ঠিক করা হয়। বিরোধী দলের সদস্যগণ সভায় আইন পাশ, বাজেট পাশ, আলোচনা ও বিতর্ক প্রভৃতি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন এবং বিভিন্ন কমিটির সদস্য হিসেবে কাজ করেন। বৈদেশিক নীতি এবং জাতীয় স্বার্থসম্পর্কিত বিষয়ে বিরোধী দল সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন।

(৩) সরকারী নীতি, কার্যকলাপ প্রভৃতির সমালোচনা করে বিরোধী দল সব সময় নিজের পক্ষে জনমতকে সংগঠিত করার চেষ্টা করে। তবে বিরোধী দলের সমালোচনা আনুগত্যপূর্ণ, দায়িত্বশীল ও গঠনমূলক হওয়া চাই।

(৪) গ্রেট ব্রিটেনে বিরোধী দল কেবল সরকারের সমালোচনাই করে না। পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করে। গ্রেট ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ সম্পর্কে সরকার এবং বিরোধী দলের মধ্যে ব্যাপক মতৈক্য বিদ্যমান। উভয়ে উভয়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। বিরোধিতা এবং সমালোচনামূলক সহযোগিতা বিরোধী দলের নীতিতে পরিণত হয়েছে। বিরোধী দলের নেতার সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরামর্শ করেন। বিরোধী দলের সহযোগিতার স্বীকৃতি হিসাবে বিরোধী দলের কোন প্রভাবশালী সদস্যকে কমন্সসভার সরকারী হিসাব পরীক্ষা কমিটির (Public Accounts Committee) সভাপতি করা হয়। তাছাড়া বিরোধীদলের গঠনমূলক প্রস্তাব অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়। এর ফলে জাতীয় গুরুত্ব সম্বলিত প্রশ্নে যৌথ সম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পরিবেশ গড়ে ওঠে। যেমন, ইয়োরোপীয় ইউনিয়নে ব্রিটেনের অবস্থান।

(৫) ব্রিটেনে বিরোধী দলকে রানীর বিকল্প সরকার বলা হয়। গুরুত্বের দিক থেকে তাই সরকারের পরেই বিরোধী দলের স্থান। বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হলে কে কোন দপ্তরের দায়িত্ব লাভ করবে তা স্থির করে ছায়ামন্ত্রীদের নিয়ে 'ছায়া মন্ত্রিসভা' গঠন করা হয়। তাই বার্কারের মতানুসারে ইংল্যাণ্ডের শাসনব্যবস্থায়, বিরোধী দল হল এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

(৬) ব্রিটিশ জনগণের কাছে বিরোধী দল স্বাধীনতার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই বিরোধী দলের ওপর কোন রকম নিয়ন্ত্রণকে জনগণ তাদের স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ বলে মনে করে। সরকার জনগণের স্বার্থ ও স্বাধীনতা বিরোধী কোন কাজ করলে বা করতে প্রয়াসী হলে বিরোধী দল তার তীব্র সমালোচনা করে এবং সেই সঙ্গে জনগণকে সজাগ করে দেয়। এই কারণে অনেকে বিরোধী দলকে ব্রিটিশ গণতন্ত্রের প্রতীক ও অভিভাবক হিসেবে অভিহিত করেন।

অনুশীলনী — ৫

শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

১। স্পীকারের ——— দিকে বসেন ক্ষমতাসীন দলের সদস্যরা এবং ——— দিকে বসেন বিরোধী দলের সদস্যরা।

২। বিরোধী দল শুধু সরকারের ---------- করে না, পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে সরকারের সঙ্গে ----- নীতিও অনুসরণ করে।

৩। ব্রিটেনে বিরোধী দলকে রানীর ---------- সরকার বলা হয়।

কমিটি ব্যবস্থা

বর্তমান যুগে আইন প্রণয়নের পদ্ধতির সঙ্গে কমিটি ব্যবস্থা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আজকের দিনে আইন প্রণয়ন পদ্ধতি অত্যন্ত জটিল হয়ে পড়ায় এবং আইনসভায় কাজের চাপ অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পাওয়ায় আইন প্রণয়নের জন্য আইনসভা কতকগুলি কমিটি গঠন করে, বিভিন্ন বিল ও প্রস্তাব সেই কমিটিগুলির কাছে পাঠিয়ে দেয়। তা ছাড়াও বর্তমানে বেশির ভাগ আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রেই বিশেষীকৃত জ্ঞানের প্রয়োজন হওয়ায় স্বল্প সংখ্যক বিশেষজ্ঞ ও দক্ষ সদস্যদের নিয়ে গঠিত কমিটিগুলির পক্ষে বিভিন্ন বিল ও প্রস্তাব পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার-বিবেচনা করে আইনসভার কাছে রিপোর্ট দাখিল করা সম্ভব। ফলে আয়তনে বৃহৎ আইনসভার পক্ষেও অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত বিষয়ের যথাযথ বিচার বিবেচনা সম্ভব।

ব্রিটেনেও আমরা কমিটি ব্যবস্থা দেখতে পাই। রানী এলিজাবেথের সময় থেকেই এই কমিটি ব্যবস্থার প্রচলন হলেও এর ব্যাপক প্রচলন ঘটে বিংশ শতাব্দী থেকে। এই কমিটি ব্যবস্থার কতকগুলি উপযোগিতা আছে। যেমন —

(১) স্বল্প সংখ্যক সদস্য নিয়ে গঠিত কমিটিগুলির পক্ষে সমস্ত দিক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিচার বিশ্লেষণ করা সম্ভব।

(২) কমিটির সদস্যরা বিশেষীকৃত জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায় প্রতিটি বিলের যথাযথ পর্যালোচনা সম্ভব হয়।

(৩) কমিটিগুলির সুচিন্তিত মতামত আইনসভাকে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সাহায্য করে।

(৪) বিভিন্ন দলের সদস্যদের নিয়ে কমিটি গঠিত হওয়ায় পারস্পরিক সহযোগিতার পথ সুগম হয়।

(৫) আইনসভার অধিবেশন বন্ধ থাকাকালীন সময়ে এই কমিটিগুলি আইনসভার কাজকে অব্যাহত রাখে।

কমন্সসভার কমিটিগুলিকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। যেমন —

(১) **সমগ্র কক্ষ কমিটি ঃ** এই কমিটি গঠিত হয় কমন্সসভার সমস্ত সদস্যকে নিয়ে। কিন্তু এই কমিটির সঙ্গে কমন্সসভার পার্থক্য হল এই যে কমন্সসভার অধিবেশনে স্পীকার সভাপতিত্ব করলেও এই কমিটি যখন কাজ করে কমন্সসভার স্পীকার তখন সভাপতিত্ব করেন না। এই কমিটির সভায়

সভাপতিত্ব করেন কমিটির চেয়ারম্যান। সমগ্র কক্ষ কমিটি যেসব উদ্দেশ্য মিলিত হয় সেগুলি হল ঃ (ক) সরকারের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করা। (খ) সেই সমস্ত বিল যা দ্রুত পাশ করা প্রয়োজন; (গ) শাসনতান্ত্রিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিল, ইত্যাদি।

(২) **স্থায়ী কমিটি ঃ** স্থায়ী কমিটি হল কমন্সসভার দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ কমিটি। এই স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ কমন্সসভার অধিবেশনের শুরুতে নির্বাচনী কমিটি কর্তৃক মনোনীত হন। কমন্সসভায় কতগুলি স্থায়ী কমিটি থাকবে সে সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম না থাকলেও প্রয়োজন অনুসারে কমন্সসভা স্থায়ী কমিটিগুলির সংখ্যা স্থির করতে পারে। সাধারণত ১৬ থেকে ৫০ জন সদস্য নিয়ে এই কমিটি গঠিত হয় এবং কমিটির সভাপতিরা স্পীকার কর্তৃক নিযুক্ত হন। সমগ্র কক্ষ কমিটিতে যেসব বিল পাঠানো হয় সেগুলি ছাড়া অন্যান্য সরকারি বিল স্থায়ী কমিটিগুলির কাছে পাঠানো হয় কমন্সসভায় দ্বিতীয় পাঠের পর। এই কমিটিগুলি থাকার কারণে বিলের বিচার বিবেচনায় কমন্সসভার সময় সংক্ষেপ হয়।

(৩) **সিলেক্ট কমিটি ঃ** কমন্সসভার সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয় বিশেষ কোনও বিল পর্যালোচনার জন্য বা কোন বিষয়ে তথ্যানুসন্ধানের জন্য। সাধারণভাবে অনধিক ১৫ জন সদস্য নিয়ে এই সিলেক্ট কমিটি গঠিত হয়। সিলেক্ট কমিটিগুলি তিন ধরনের হতে পারে—(ক) অধিবেশন কমিটি, (খ) বিশেষজ্ঞ কমিটি, (গ) অস্থায়ী কমিটি।

(৪) **বেসরকারি বিল কমিটি ঃ** এই ধরণের কমিটি গঠিত হয় বেসরকারি বিল পর্যালোচনার জন্য এই কমিটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়—(ক) বিতর্কিত বিলের জন্য এবং (খ) অ-বিতর্কিত বিলের জন্য।

(৫) **যৌথ কমিটি ঃ** পার্লামেন্টের উভয় কক্ষ থেকে ৭ জন করে সদস্য নিয়ে (মোট ১৪ জন) যৌথ কমিটি গঠিত হয়। এই যৌথ কমিটি অ-রাজনৈতিক এবং উভয় কক্ষের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করে।

পার্লামেন্টের উভয়কক্ষ ও তার সদস্যদের বিশেষ অধিকার

ব্রিটেনে পার্লামেন্টিয় ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী সমষ্টিগতভাবে কমন্সসভা এবং ব্যক্তিগতভাবে ঐ সভার সদস্যগণ কতকগুলি বিশেষ অধিকার ও অব্যাহতি ভোগ করে থাকেন। কমন্সসভার সদস্যগণ যাতে কোন রকম অযৌক্তিক বাধার সম্মুখীন না হয়ে যথাযথভাবে দায়িত্ব সম্পাদন করতে পারেন, সেই উদ্দেশ্যে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধা বা অধিকার প্রদান করা হয়েছে। শাসনবিভাগের স্বৈরাচারী মানসিকতার বিরুদ্ধে কমন্সসভার সদস্যদের এই সমস্ত বিশেষ সুযোগ সুবিধার গুরুত্ব ও তাৎপর্য অস্বীকার করা যায় না। ঐতিহাসিক বিচারে এই সমস্ত সুযোগ সুবিধাগুলি হল ষোড়শ শতাব্দীতে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে পার্লামেন্টের সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফল।

আলোচনার সুবিধার জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ও তার সদস্যদের অধিকারগুলিকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

(১) সভার আভ্যন্তরীণ কার্যপদ্ধতি নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার।

(২) কমন্সসভায় বহিরাগতদের প্রবেশ নিষেধ করার অধিকার।

(৩) রাজার সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার অধিকার।

(৪) নিজের অবমাননার জন্য সদস্য ও অন্য যে কোন ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানের অধিকার।

দ্বিতীয়তঃ লর্ডসভা ও তার সদস্যগণ যেসব অধিকার ভোগ করেন।

(১) লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে।

(২) লর্ডসভার সদস্যগণ রাজা বা রানীর সঙ্গে সরাসরি সাক্ষাৎ করার অধিকার ভোগ করেন।

(৩) লর্ড উপাধি সংক্রান্ত যাবতীয় বিরোধের মীমাংসার অধিকার লর্ডসভা ভোগ করে।

তৃতীয়তঃ কমন্সসভা ও লর্ডসভা ও তার সদস্যগণ যৌথভাবে যেসব অধিকার ভোগ করেন ঃ

(১) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের অধিবেশন চলাকালীন সময়ে কোন কক্ষের সদস্যকেই দেওয়ানী মামলার দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না।

(২) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের পার্লামেন্টের অভ্যন্তরে মতামত প্রকাশের অধিকার রয়েছে।

(৩) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের কাজকর্ম সম্পর্কিত রিপোর্ট, কার্যাবিবরণী ও কাগজপত্র প্রকাশ করার স্বাধীনতা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে বলা হয়েছে যে এই কারণে কোন সদস্যকে আদালতে অভিযুক্ত করা যাবে না।

৯৯.৩.৩ আইন প্রণয়ন পদ্ধতি

ব্রিটেনে পার্লামেন্টের হাতেই রয়েছে আইন প্রণয়নের যাবতীয় ক্ষমতা। আইনসভার অনুমোদনের জন্য উত্থাপিত আইনসংক্রান্ত প্রস্তাবই 'বিল' হিসেবে পরিচিত। বিষয়বস্তুর দিক থেকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত বিলগুলিকে দুভাগে ভাগ করা যায় ঃ (ক) সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল বা পাবলিক বিল; (খ) বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল বা প্রাইভেট বিল। সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিলকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায়—(১) সরকারি বিল এবং (২) বেসরকারি সদস্যগণ কর্তৃক উত্থাপিত বিল। অন্যদিকে বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিলও আবার দু'ভাগে বিভক্ত—বেসরকারি বিল এবং অন্যান্য বিল। তাছাড়া আরও এক ধরনের বিল আছে যা মিশ্র বা সঙ্কর জাতীয় বিল নামেই পরিচিত। এই ধরনের বিলগুলিতে সাধারণের স্বার্থ ও বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিলের অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করা যায়।

সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল

সাধারণ স্বার্থ সংক্রান্ত অধিকাংশ বিল হল সরকারী বিল। কারণ মন্ত্রীরাই সাধারণতঃ এই সমস্ত

বিল উত্থাপন করেন। এগুলি তাই কমন্সসভায় উত্থাপিত হয়ে থাকে। এই ধরনের বিল পাশের পদ্ধতি নিম্নরূপ ঃ

(১) বিল উত্থাপন ও প্রথম পাঠ ঃ সাধারণতঃ অধিকাংশ পাবলিক বিল কমন্সসভাতেই উত্থাপিত হয় এবং কোনও না কোনও মন্ত্রী তা উত্থাপন করেন। তবে বিল উত্থাপন করার আগে উত্থাপককে নোটিশ দিতে হয়। এই নোটিশ পাওয়ার পর স্পীকারের সম্মতি সাপেক্ষে কমন্সসভার কর্মসচিবের কাছে বিলটি পাঠানো হয়। কর্মসচিব এইসময় শুধু বিলটির শিরোনাম পাঠ করেন। একেই বিলের প্রথম পাঠ বলা হয়। এরপর স্পীকারের অনুরোধক্রমে উত্থাপক দ্বিতীয় পাঠের তারিখ ঘোষণা করেন। এইসময় বিলটি ছাপানো হয় এবং সদস্যদের মধ্যে বিলটির কপি বিতরণ করা হয়।

(২) দ্বিতীয় পাঠ ঃ দ্বিতীয় পর্যায়ই হল বিলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর বা পর্যায়। এই পর্যায়ে বিলের উত্থাপক বিলটির উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তু সম্পর্কে দীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এরপরই বিলের উদ্দেশ্য ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করে সরকারি ও বিরোধী পক্ষের মধ্যে তর্কবিতর্ক চলে। এই পর্যায়েই বিলটির ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে যায়। কেননা এই সময়ই বিরোধী পক্ষ সমালোচনার মাধ্যমে বিলটিকে বাতিল করতে পারে বা সংশোধনের চেষ্টা করতে পারে। তবে বিরোধী পক্ষের এই ধরনের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হলে দ্বিতীয় পর্যায়-এর সমাপ্তি ঘটে।

(৩) কমিটি পর্যায় ঃ এর পর বিলটি তৃতীয় স্তরে প্রবেশ করে। এই পর্যায়ে বিলটিকে স্থায়ী কমিটিগুলির যে কোন একটির কাছে পাঠানো হয়। তবে সমগ্র কক্ষ কমিটি বা সিলেক্ট কমিটির কাছে বিলটিকে পাঠানোর সিদ্ধান্ত কমন্সসভায় গৃহীত হলে বিলটিকে আর স্থায়ী কমিটির কাছে পাঠানো হয় না। যে কমিটির কাছেই পাঠানো হোক না কেন বিলটির বিভিন্ন ধারা ও উপধারা নিয়ে কমিটিতে বিস্তারিতভাবে আলোচনা হয় এবং কমিটি বিলের কোন অংশের সংশোধনের জন্য সুপারিশও করতে পারে। তবে বিলের উদ্দেশ্য ও নীতি সংশোধন করার ক্ষমতা কোন কমিটির থাকে না।

(৪) রিপোর্ট পর্যায় ঃ সমগ্র কক্ষ কমিটিতে যদি বিলটি আলোচিত হয় তবে রিপোর্ট পর্যায়ে আর কোন বিতর্ক হয় না। আনুষ্ঠানিকভাবে উপস্থিত করা হয় মাত্র। বিলটি যদি কোন স্থায়ী বা সিলেক্ট কমিটি বিচার-বিবেচনা করে, সেক্ষেত্রে রিপোর্ট পর্যায়ে বিতর্ক হয়। তবে কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করার ব্যাপারে কমন্সসভার কোন বাধ্যবাধকতা থাকে না।

(৫) তৃতীয় পাঠ ঃ তৃতীয় পাঠের সময় বিলটি সামগ্রিকভাবে বিবেচিত হয়। এই স্তরে বিলটির ধারা উপধারা নিয়ে কোন আলোচনা হয় না বা কোন সংশোধনী প্রস্তাবও আনা যায় না। শুধুমাত্র শব্দগত পরিবর্তন করা যায়। এই স্তরে বিলটিকে সামগ্রিকভাবে গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করতে হয়।

(৬) ষষ্ঠ পর্যায় ঃ এইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে কমন্সসভায় বিল পাশ হওয়ার পর পার্লামেন্টের অন্য কক্ষের অনুমোদনের জন্য তা পাঠানো হয়। আবার প্রথমে লর্ড সভায় পাশ হলে সেই

বিল কমন্সসভার অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়। বস্তুতঃ কম সভার মত একইভাবে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে সেই বিল যদি লর্ডসভায় পাশ হয় তবে তা অনুমোদনের জন্য রাজা বা রানীর কাছে যায়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার যে লর্ডসভা যদি কমন্সসভার সঙ্গে বিলের ব্যাপারে একমত না হয় তাহলে ঐ বিলপাশ এক বছর বিলম্বিত হতে পারে মাত্র। আবার লর্ডসভায় বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে প্রথমে বিল গৃহীত হলে কমন্সসভা সেই বিল প্রত্যাখ্যান বা সংশোধন করতে পারে।

(৭) **সপ্তম পর্যায় ঃ** এই পর্যায়ই হল বিলপাশের সর্বশেষ পর্যায়। এই পর্যায়ে রাজা বা রানীর সম্মতির জন্য বিলটি পাঠানো হয়। তবে বিলে রাজা বা রানীর সম্মতিদান একটি আনুষ্ঠানিক ব্যাপার মাত্র।

ব্যক্তিগত সদস্যের বিল

মন্ত্রীগণ ছাড়া পার্লামেন্টের কোন সাধারণ সদস্য সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে ব্যক্তিগত উদ্যোগে কোন বিল উত্থাপন করলে সেই বিলটিকে ব্যক্তিগত সদস্যের বিল বলে। ব্যক্তিগত সদস্যের বিল উত্থাপিত ও বিবেচিত হওয়ার পথে বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা আছে। যেমন —

(১) সরকার পক্ষ এই ধরনের বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করতে পারে।

(২) সাধারণতঃ ব্যক্তিগত সদস্যের বিলের জন্য বরাদ্দ সময় খুব কমই থাকে।

(৩) বিলের খসড়া প্রস্তাব রচনার জন্য যে বিশেষীকৃত জ্ঞানের প্রয়োজন অনেক সদস্যেরই তা থাকে না।

(৪) কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সদস্যের পক্ষে বিলের খসড়া প্রস্তুত করা অত্যন্ত ব্যয়বহুল হয়ে দাঁড়ায়।

(৫) কোনও কোনও ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত উদ্যোগে এই ধরনের বিল উত্থাপিত হলেও পরবর্তী সময়ে বিল উত্থাপকের এই ব্যাপারে আর কোন উৎসাহ থাকে না।

(৬) ব্যক্তিগত সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত বিল সরকারী নীতির বিরোধী হলে ক্ষমতাসীন দল থেকে দ্বিগুণ বিরোধিতা আসে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার যে ব্যক্তিগত সদস্যের বিলকেও পূর্বোক্ত পর্যায় অতিক্রম করে আইনে পরিণত হ'তে হয়।

বিশেষ স্বার্থ সংক্রান্ত বিল

এই ধরনের বিলকে প্রাইভেট বিল বলা হয়। এই বিলগুলি পার্লামেন্টের সদস্যদের উদ্যোগে

উত্থাপিত হয় না। কোনও ব্যক্তি বা সংস্থার আবেদনের ভিত্তিতে পালামেন্টে এই ধরনের বিল উত্থাপিত হতে পারে। তবে বিলের সঙ্গে যাদের স্বার্থ জড়িত তাদের সকলকেই বিল সম্পর্কে জানাতে হয়। বিলটি উত্থাপনের পূর্বে পার্লামেন্টের প্রাইভেট বিলের আবেদনপত্রের পরীক্ষকগণ বিলটিকে খুঁটিয়ে দেখে এবং যদি দেখা যায় যে বিলটির ক্ষেত্রে নিয়ম-কানুন অনুসরণ করা হয়েছে তাহলে বিলটি যে কোন কক্ষে উত্থাপন করা হয়। এইভাবেই বিলের প্রথম পাঠ অনুষ্ঠিত হয়। এরপর দ্বিতীয় পাঠের সময় বিলটি সম্পর্কে কোন আপত্তি তোলা না হলে সেটিকে একটি আপত্তিহীন বিল কমিটির কাছে পাঠানো হয়। আর বিলটি সম্পর্কে আপত্তি উঠলে সেটিকে একটি সাধারণ প্রাইভেট বিল কমিটির কাছে পাঠানো হয়। এই অবস্থায় বিলটি বাতিল হতে পারে বা কমিটির দ্বারা গৃহীত হতে পারে। বিলটি গৃহীত হলে রিপোর্টসহ বিলটি সংশ্লিষ্ট কক্ষে ফেরত আসে এবং বিলটির তৃতীয় পাঠ শুরু হয়। এই পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট কক্ষ কর্তৃক বিলটি গৃহীত হওয়ার পরে তা অন্যকক্ষে যায় এবং অন্যকক্ষ কর্তৃক গৃহীত হওয়ার পর তা রাজা বা রানীর সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। রাজা বা রানীর সম্মতি পেলে বিলটি আইনে পরিণত হয়।

অর্থবিল

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়। অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে লর্ডসভার কার্যত কোনও ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ১৯১১ সালের পার্লামেন্ট আইনে অর্থবিলের যে সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে তাতে বলা হয়েছে যে কোনও বিলকে অর্থবিল বলে গণ্য করা হবে যদি বিলটি নিম্নলিখিত কোনও একটি বিষয়ের সঙ্গে জড়িত থাকে —

(ক) কর ধার্য, বিলোপ, পরিহার, পরিবর্তন বা নিয়ন্ত্রণ;

(খ) সরকার কর্তৃক ঋণগ্রহণ বা পরিশোধ সংক্রান্ত প্রস্তাব;

(গ) সঞ্চিত তহবিল বা আকস্মিক তহবিলে অর্থপ্রদান বা প্রত্যাহার;

(ঘ) সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থ বিনিয়োগ;

(ঙ) কোন ব্যয়কে সঞ্চিত তহবিলের ওপর ধার্য ব্যয় বলে ঘোষণা;

(চ) অর্থসংক্রান্ত বিষয়ে আইনের প্রস্তাব।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য.যে কোনও বিল অর্থবিল কিনা সেই বিষয়ে কমন্সসভার স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অর্থবিল পাশের পদ্ধতি আলোচনা প্রসঙ্গে যে সমস্ত বিষয় স্মরণে রাখা দরকাব সেগুলি হল—(১) অর্থবিল কেবলমাত্র কমন্সসভাতেই উত্থাপন করা যায়। (২) পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া সরকার কর ধার্য, সংগ্রহ বা ঋণগ্রহণ করতে পারে না। (৩) রাজা বা রানীর সম্মতি

সাপেক্ষে মন্ত্রীরাই কেবলমাত্র অর্থবিল উত্থাপন করতে পারেন। (৪) সরকার দাবি না জানালে পার্লামেন্ট অর্থ মঞ্জুর করতে পারে না। (৫) কোনও বিল অর্থবিল কিনা সে ব্যাপারে স্পীকারের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। (৬) অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা নয়, কমন্সসভার একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। (৭) মন্ত্রীদের উদ্যোগ ব্যতীত কমন্সসভা নিজে উদ্যোগী হয়ে কোনও প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে না।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অর্থবিল পাশের পদ্ধতিকে দু'ভাগে ভাগ করে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

(১) **ব্যয়-বরাদ্দ মঞ্জুর ঃ** সরকারের ব্যয়-বরাদ্দকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—(ক) সঞ্চিত তহবিলের উপর ধার্য ব্যয়; (খ) বাৎসরিক অনুমোদনের সাপেক্ষে ব্যয়। সঞ্চিত তহবিল থেকে স্থায়ী ব্যয় পার্লামেন্টের স্থায়ী আইন দ্বারা নির্দিষ্ট থাকে। এই ধরনের ব্যয়ের জন্য প্রতিবছর আইন প্রণয়ন করার প্রয়োজন হয় না। উদাহরণস্বরূপ রাজা বা রানীর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত ব্যয়। অন্যদিকে কমন্সসভা প্রতিবছর বিল পাশ করে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের জন্য সাধারণ ব্যয় অনুমোদন করে---যা অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যয় হিসেবে পরিচিত। প্রতি বছর অক্টোবর মাস থেকেই অর্থদপ্তর পরবর্তী বছরের জন্য আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব পেশ করার জন্য বিভিন্ন দপ্তরকে নির্দেশ দেয়। এরপর বিভিন্ন সরকারি দপ্তর তাদের আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব অর্থদপ্তরে পাঠায়।

(২) **রাজস্ব অনুমোদন ঃ** ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী প্রতিবছর ৩১শে মার্চের মধ্যে আগামী আর্থিক বছরের জন্য কমন্সসভায় একটি বাজেট পেশ করেন। প্রতিটি আর্থিক বছরের জন্য সরকার কর্তৃক প্রণীত আয়ব্যয়ের খসড়া হিসেবকে বাজেট বলে। এই বাজেট প্রণয়নের মুখ্য দায়িত্ব অর্থদপ্তরের হলেও এই অর্থদপ্তরের কাজকর্ম পরিচালনার জন্য একটি বোর্ড থাকে। এই বোর্ডের প্রধান হলেন গ্রেট ব্রিটেনের অর্থমন্ত্রী। অর্থমন্ত্রীর দায়িত্ব হল বাজেটের গোপনীয়তা রক্ষা করা। বাজেটে নতুন কর ব্যবস্থার প্রবর্তন থেকে শুরু করে আমদানি-রপ্তানি ও অন্তঃশুল্কসহ বিভিন্ন বিষয় থাকে। এই বাজেট প্রস্তাব কমন্সসভায় আলোচিত হওয়ার পর তা উপায় নির্ধারণ কমিটিতে যায়। এই কমিটি কর ধার্য সম্পর্কে যেসব প্রস্তাব করে, সেগুলি আবার কমন্সসভায় যায়।

সরকারি আয়ব্যয়ের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ

(১) নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক (The Comptroller and Auditor General) ঃ নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক হলেন এমন একজন পদাধিকারী যিনি আর্থিক বিষয়ে পার্লামেন্টের পক্ষ থেকে সরকারি আয় ব্যয়ের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখেন।

(২) সরকারি হিসাবসংক্রান্ত কমিটি (The Public Accounts Committee) ঃ বিভিন্ন সরকারি দপ্তরগুলির ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করে নিয়ন্ত্রক ও মহাগণনা পরীক্ষক যে রিপোর্ট কমন্সসভায় পেশ করেন তা পর্যালোচনা করে দেখা সরকারি গণিতক কমিটির অন্যতম প্রধান কাজ।

(৩) ব্যয় কমিটি (The Expenditure Committee) ঃ ১৯১২ সালে যে The Estimate

কমিটি গঠিত হয়েছিল ১৯৭১ সালে তার নাম পরিবর্তন করে The Expenditure Committee রাখা হয়। এই কমিটির কাজ হল কমন্সসভায় উত্থাপিত সরকারের ব্যয় সম্পর্কিত কাগজপত্র পরীক্ষা করা এবং আনুমানিক ব্যয়ের হিসাব বিচার বিবেচনা করা।

৯৯.৩.৪ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব

ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কোনও লিখিত সংবিধান থেকে সার্বভৌমত্ব অর্জন করে নি। সেখানে পূর্বতন চরম রাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে সুদীর্ঘ সংগ্রামের ফলশ্রুতি হিসাবে পার্লামেন্ট সার্বভৌম কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছে।

তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের এই সার্বভৌমত্ব আইনগত---রাজনৈতিক নয়। আইনগত বিচারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। ব্রিটেনে আইন প্রণয়নকারী একমাত্র সংস্থা হল পার্লামেন্ট। সুতরাং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের হাতেই আইনগত সার্বভৌমত্ব ন্যস্ত আছে। অধ্যাপক ডাইসির মতানুসারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের নিরঙ্কুশ আইনগত প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত। ডাইসির অভিমত অনুসারে (১) ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যে কোনও আইন প্রণয়ন করতে পারে; (২) পূর্বে প্রণীত যে কোনও আইনকে সংশোধন বা বাতিল করতে পারে; (৩) শাসনতন্ত্রও সংশোধন করতে পারে। ব্রিটেনের আদালত পার্লামেন্টের আইন প্রণয়নের ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করতে পারে না।

তবে বাস্তবে পার্লামেন্টের আইনগত সার্বভৌম ক্ষমতা কার্যত সীমাবদ্ধ।

(১) ব্রিটিশ পার্লামেন্টের আইনগত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব জনমতের দ্বারা সীমাবদ্ধ।

(২) প্রচলিত প্রথা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক ন্যায় নীতিবোধ, শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, ঐতিহ্য, ধর্মীয় বিশ্বাস প্রভৃতির দ্বারাও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাজকর্ম বিশেষভাবে নিয়ন্ত্রিত হয়।

(৩) ক্যাবিনেট প্রথা গড়ে ওঠার দরুন এখন পার্লামেন্ট ক্যাবিনেটকে নিয়ন্ত্রণ করে না, ক্যাবিনেটই পার্লামেন্টকে নিয়ন্ত্রণ করে।

(৪) আন্তর্জাতিক আইনগুলিও ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্বের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপ করে।

(৫) ব্রিটিশ আদালত আইনের বৈধতা বিচার করতে না পারলেও আইনের ব্যাখ্যা দিতে পারে এবং পার্লামেন্টের ওপর আংশিকভাবে হলেও কিছুটা নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে।

(৬) স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহের চাপও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট পুরোপুরি উপেক্ষা করতে পারে না।

পরিশেষে বলা যায় যে পার্লামেন্টের আইনগত সার্বভৌমত্ব বর্তমানে বহুলাংশে তত্ত্বসর্বস্ব। ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই এখন ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হিসেবে বিরাজ করছে।

৯৯.৪ সারাংশ

পার্লামেন্ট গ্রেট ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ন সংস্থা। রাজা বা রানী, লর্ডসভা ও কমন্সসভা নিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট গঠিত।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ হল লর্ডসভা। এই লর্ডসভা কেবল পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন দ্বিতীয় কক্ষই নয়, সর্ববৃহৎ দ্বিতীয় কক্ষও বটে। এই কক্ষের কোন সদস্যই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত নন। তাই এই কক্ষটিকে অগণতান্ত্রিক কক্ষ বলে। সেই কারণে এই কক্ষটির ক্ষমতাও কম। অর্থবিল পাশের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কোন ক্ষমতাই নেই। তবে বিচারব্যবস্থার দিক থেকে লর্ডসভা ব্রিটেনে সর্বোচ্চ আপীল আদালত।

পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষ কমন্সসভা জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত হয়। কমন্সসভা আইন প্রণয়নে মুখ্য ভূমিকা নেয়। সেজন্য কমন্সসভায় কমিটি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। মন্ত্রীসভা তার কাজের জন্য কমন্সসভার কাছে দায়িত্বশীল থাকে। কমন্সসভায় বিরোধীদলের দায়িত্ব খুব গুরুত্বপূর্ণ।

কমন্সসভার সভাপতিকে স্পীকার বা অধ্যক্ষ বলা হয়। তাঁর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং তিনি রাজনীতি নিরপেক্ষভাবে তাঁর দায়িত্ব সম্পাদন করেন।

অর্থসংক্রান্ত ব্যাপারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ব্যাপক ক্ষমতার অধিকারী। তবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের অর্থসংক্রান্ত ক্ষমতা বলতে কমন্সসভার ক্ষমতাকেই বোঝায়।

পার্লামেন্টের উভয়কক্ষের সদস্যরাই কিছু কিছু বিশেষ অধিকার ভোগ করেন। তত্ত্বগতভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সার্বভৌম হলেও বর্তমানে ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ক্যাবিনেটই ক্ষমতার মূল কেন্দ্র হিসাবে বিরাজ করছে। তাই বলা হয় ব্রিটেনে এখন ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

৯৯.৫ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। কমন্সসভা কীভাবে সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করে?

২। ব্রিটিশ কমন্সসভা কীভাবে সরকারি আয়-ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করে?

৩। কমন্সসভার সভাপতি কে ? তিনি কয় বছর তাঁর পদে বহাল থাকেন?

৪। স্পীকারের নির্ণায়ক ভোট কী ?

৫। কমন্সসভায় কয় ধরনের কমিটি আছে এবং এগুলি কী কী ?

৬। গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধী দলের প্রধান চারটি বৈশিষ্ট্য কী কী ?

৭। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাসের যে কোন দুটি কারণ লিখুন।

৮। কমন্সসভার সদস্যদের দুটি বিশেষাধিকারের উল্লেখ করুন।

৯। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলতে কী বোঝায়?

৯৯.৬ উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

১। (ক)— ☑, (খ)—☑, (গ)—☒।

২। (ক) ব্রিটেনের লর্ডসভা (১) আইনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (২) শাসনসংক্রান্ত ক্ষমতা, (৩) বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা এবং (৪) অন্যান্য ক্ষমতা ভোগ করে।

(খ) ব্রিটেনের লর্ডসভার বিরুদ্ধে দুটি যুক্তি হল—(১) লর্ডসভার গঠন অগণতান্ত্রিক, (২) লর্ডসভার সদস্যদের ব্যাপক অনুপস্থিতি ও ঔদাসীন্য এই কক্ষকে অপ্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করেছে।

(গ) লর্ডসভার অস্তিত্বের স্বপক্ষে যেসব যুক্তি দেখানো হয় সেগুলি হ'ল—(১) জনগণের কাছে দায়িত্বশীল থাকতে হয় না বলে লর্ডসভা নিরপেক্ষভাবে কাজ করতে পারে। (২) লর্ডসভা অবিবেচনা প্রসূত আইন প্রণয়নের পথে বাধা সৃষ্টি করে। (৩) লর্ডসভা ব্রিটেনের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে।

(ঘ) অর্থবিলের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ লর্ডসভার কার্যত কোন ক্ষমতা নেই বললেই চলে। ১৯১১ সালে প্রণীত আইনের ফলে বর্তমানে অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভা মাত্র ১ মাস বিলটিকে আটকে রাখতে পারে। একমাসের মধ্যে লর্ডসভা সেই বিলে সম্মতি না দিলে লর্ডসভার সম্মতি ছাড়াই বিলটিকে রাজা বা রানীর সম্মতির জন্য পাঠানো হয়। অতএব অর্থবিলের ক্ষেত্রে লর্ডসভার কোন ভূমিকাই নেই।

(ঙ) লর্ডসভা ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য ও উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সর্বোচ্চ আপীল আদালত হিসেবে কাজ করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে কেবলমাত্র আইনজ্ঞ লর্ডগণই এই কাজে অংশগ্রহণ করেন। তবে আপীল আদালতের ভূমিকা পালন করা ছাড়াও লর্ডসভার আরও কিছু বিচারসংক্রান্ত ক্ষমতা আছে।

অনুশীলনী — ২

১। পাঁচ, (২) নিম্ন, (৩) স্পীকার, (৪) ব্যয়।

অনুশীলনী — ৩

১। রাজনৈতিক নিরপেক্ষতা, (২) সভাপতি।

অনুশীলনী — ৪

১। (ক)—☒, (খ)—☑, (গ)—☒, (ঘ)—☑, (ঙ)—☑,

অনুশীলনী — ৫

১। ডানদিকে, বাঁদিকে

২। সমালোচনা, সহযোগিতার

৩। বিকল্প

সর্বশেষ অনুশীলনী ঃ

১। সংসদীয় শাসনব্যবস্থার মৌলিক নীতি অনুসারে ব্রিটেনের মন্ত্রীসভার সদস্যগণ ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়ী থাকেন। কমন্সসভার আস্থা হারালে মন্ত্রিসভাকে পদত্যাগ করতে হয়। তাছাড়া কমন্সসভা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও বিতর্ক অনুষ্ঠান এবং মুলতুবী প্রস্তাব, নিন্দাসূচক প্রস্তাব, ছাঁটাই প্রস্তাব, দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব, অনাস্থা প্রস্তাব প্রভৃতি উত্থাপনের মাধ্যমে মন্ত্রিসভাকে কার্যকরীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

২। সরকারি আয়-ব্যয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও কমন্সসভার একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। প্রতিবছর অর্থমন্ত্রী আগামী বছরের সম্ভাব্য আয়-ব্যয় উল্লেখ করে যে বাজেট পেশ করেন তা কমন্সসভাতেই পেশ করা হয়। কমন্সসভার অনুমতি সাপেক্ষেই সরকার কর ধার্য, সংগ্রহ এবং বিদেশ থেকে ঋণ গ্রহণ করতে পারে। এছাড়া সঞ্চিত তহবিল থেকে অর্থের প্রয়োজন হলে সরকারকে কমন্সসভার অনুমোদন নিতে হয়।

৩। কমন্সসভার সভাপতি হলেন কমন্সসভার স্পীকার। তাঁর কার্যকালের মেয়াদ পাঁচ বছর। অবশ্য কার্যকাল শেষ হওয়ার আগেই তিনি পদত্যাগ করতে পারেন। আবার নির্দিষ্ট সময়ের আগে তিনি পদচ্যুতও হতে পারেন।

৪। কমন্সসভার ভোটাভুটিতে বা আলোচনায় সাধারণত স্পীকার অংশগ্রহণ করেন না। তবে কোন বিষয়ে পক্ষে বা বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে সেই বিষয়ে নিষ্পত্তির জন্য তিনি যে ভোট দেন তাই নির্ণায়ক ভোট হিসেবে পরিচিত।

৫। কমন্সসভায় পাঁচ ধরনের কমিটি আছে। সেগুলি হ'ল—(১) সমগ্র কক্ষ কমিটি, (খ) স্থায়ী কমিটি, (গ) সিলেক্ট কমিটি, (ঘ) বেসরকারি বিল কমিটি এবং (ঙ) যৌথ কমিটি।

৬। (ক) গ্রেট ব্রিটেনের বিরোধী দল একটি সুসংগঠিত ও সুশৃংখল ক্ষমতার কেন্দ্র; (খ) কমন্সসভাতেই বিরোধী দলের অস্তিত্ব বর্তমান; (গ) সরকারি দলের পতন হলে বিরোধী দল ক্ষমতাসীন হয়; (ঘ) কমন্সসভার কার্যক্রম নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের অস্তিত্ব থাকে।

৭। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে তত্ত্বগতভাবে সার্বভৌম। বাস্তবে পার্লামেন্টের সব ক্ষমতা ক্যাবিনেটই ভোগ করে। কারণ— (ক) ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বর্তমানে ক্যাবিনেটের ক্ষমতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। (খ) দলীয় ব্যবস্থাও পার্লামেন্টের ক্ষমতা হ্রাস করেছে।

৮। কমন্সসভার সদস্যদের দুটি গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হল — (ক) কমন্সসভার অধিবেশন চলাকালীন কোন কক্ষের সদস্যকেই দেওয়ানী মামলার দায়ে গ্রেপ্তার করা যায় না। (খ) সভার অধিবেশনে বা কোন কমিটিতে কোন কিছু বলার জন্য কোন সদস্যকেই আদালতে অভিযুক্ত করা যায় না।

৯। পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব বলতে পার্লামেন্টের চরম ও অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতাকে বোঝায়। আইনগত দিক থেকে বিচার করে একথা বলা যেতে পারে যে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ক্ষমতা অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত। এই সংস্থার হাতেই আইন প্রণয়নের চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা ন্যস্ত। এই সংস্থা যে কোন আইন প্রণয়ন করতে পারে, যে কোন আইনকে সংশোধন বা বাতিল করতে পারে। পার্লামেন্টের এই ক্ষমতা সম্পর্কে কেউ কোন প্রশ্ন তুলতে পারে না।

৯১.৭ গ্রন্থপঞ্জী

১। *J. Harvey and L. Bather.* — The British Constitution, Macmillan, St. Martin's Press, 1970।

২। *Sir Ivor Jennings* — Cabinet Government, Cambridge University Press, 1959।

৩। *ডঃ অনাদিকুমার মহাপাত্র* — নির্বাচিত শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি পরিচয়, সুহৃদ পাবলিকেশন, ১৯৯৮।

৪। *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ* — তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পালবিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৫। *সুদর্শন ভট্টাচার্য* — (প্রশ্নোত্তরে) তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, ২০০০।

একক ১০০ □ রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী

গঠন

১০০.১ উদ্দেশ্য

১০০.২ প্রস্তাবনা

১০০.৩ রাজনৈতিক দল

১০০.৩.১ রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকার কারণ

১০০.৩.২ ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

১০০.৩.৩ ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

১০০.৪ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

১০০.৪.১ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

১০০.৪.২ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

১০০.৪.৩ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব

১০০.৫ সারাংশ

১০০.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

১০০.৭ উত্তরমালা

১০০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১০০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়লে আপনারা যা জানতে পারবেন তা হ'ল —

- ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় কী ধরনের রাজনৈতিক দল রয়েছে।
- ঐ রাজনৈতিক দলব্যবস্থার সঙ্গে শাসনব্যবস্থার কী ধরনের সম্পর্ক।
- সমাজে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে কতদূর প্রভাবান্বিত করে।

১০০.২ প্রস্তাবনা

ব্রিটেনে সংসদীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। তাই এখানে রাজনৈতিক দলব্যবস্থা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দ্বিদলীয় ব্যবস্থা ব্রিটিশ সংসদীয় গণতন্ত্রকে সাফল্যের সঙ্গে বহন করে নিয়ে চলেছে। তার পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী

গোষ্ঠীও এখানে অত্যন্ত কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। তাই ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থাকে বুঝতে গেলে রাজনৈতিক দলের পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর বিশ্লেষণও প্রয়োজন।

১০০.৩ রাজনৈতিক দল

রাজনৈতিক দল গণতন্ত্রের প্রাণ। বর্তমান রাজনৈতিক ব্যবস্থায় গণতন্ত্র ও দলীয় ব্যবস্থা সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। বস্তুত যে কোন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় আমরা রাজনৈতিক দলগুলিকে চালিকাশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। এই রাজনৈতিক দলগুলির মাধ্যমেই ব্যক্তি বা গোষ্ঠী রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারে। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় যে দল যখন সফল হয় সে দলই ক্ষমতা দখল করে। অন্যদিকে আবার রাজনৈতিক দলকে হাতিয়ার করে জনগণ সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। সুতরাং নানা কারণেই এই রাজনৈতিক দলগুলিকে সমাজের সঙ্গে শাসনব্যবস্থার সংযোজক ও অপরিহার্য অঙ্গ বলে মনে করা হয়।

১০০.৩.১ রাজনৈতিক দলব্যবস্থার ক্রমবিকাশ ও দ্বিদলীয় ব্যবস্থা চালু থাকার কারণ ঃ

ব্রিটেনের রাজনৈতিক ইতিহাস পাঠ করলে আমরা দেখতে পাই যে দলীয় ব্যবস্থাই ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থার ভিত্তি। প্রকৃতপক্ষে প্রায় দু'শো বছর ধরে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল টোরি ও হুইগ দল। কিন্তু পরবর্তী সময়ে টোরি দল রক্ষণশীল দলে এবং হুইগ দল উদারনৈতিক দলে রূপান্তরিত হয়। এই দুটি দলই দীর্ঘদিন ব্রিটেনের রাজনৈতিক জীবনের ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। কিন্তু ১৯০৬ সাল নাগাদ বিট্রেনে তৃতীয় একটি দলের আবির্ভাব হয় যা শ্রমিক দল নামে পরিচিত। ১৯১৮ সাল পর্যন্ত উদারনৈতিক দল ও রক্ষণশীল দল ব্রিটেনের রাজনৈতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। কিন্তু ১৯১৮ সালের পর থেকে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় সংখ্যা গরিষ্ঠতা লাভ করতে থাকে। অবশ্য এর অর্থ এই নয় যে, বর্তমানে রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল ছাড়া যুক্তরাষ্ট্র অন্য কোন রাজনৈতিক দলের অস্তিত্ব নেই। বরং বলা যায় যে আজকের ব্রিটেনে অর্থাৎ যুক্তরাজ্যে ছোট বড় ২১টি রাজনৈতিক দল রয়েছে যার মধ্যে কম্যুনিষ্ট পার্টি (CPGB) অন্যতম। নির্বাচনের সময়ে এই সংখ্যার হ্রাসবৃদ্ধি ঘটে। বেশীর ভাগ দলই সেখানে অঞ্চল ভিত্তিক। এখানে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধীকরণের কোন ব্যবস্থাই নেই। বর্তমানে যেসব উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক দল রয়েছে সেগুলি হ'ল — রক্ষণশীল দল, শ্রমিক দল, সামাজিক গণতন্ত্রী দল (Social Democratic Party), সামাজিক ও উদারনৈতিক গণতন্ত্রী (Social and Liberal Democrates) এবং কমিউনিষ্ট দল। এ ছাড়াও কয়েকটি আঞ্চলিক দল রয়েছে। যেমন — স্কটল্যাণ্ডের স্কটিশ জাতীয় দল (Scottish National Party), ওয়েলসের জাতীয়তাবাদী দল প্লেইড সিমরু (Plaid Cymru) এবং উত্তর আয়ারল্যাণ্ডের সরকারী আলস্টার ইউনিয়নবাদী দল (Official Ulster Unionist Party),

গণতান্ত্রিক ইউনিয়নবাদী দল (Democratic Unionist Party), সামাজিক গণতান্ত্রিক শ্রমিক দল (Social Democratic Labour Party), আলস্টার জনগণের ইউনিয়নবাদী দল (Ulster People's Unionist Party) ও শিন ফেইন (Sinn Fein) দল।

তবে সামগ্রিক বিচারে ব্রিটেনের দলীয়ব্যবস্থা মূলত দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। ব্রিটেনে এই দ্বিদলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠার পেছনে যে সমস্ত কারণ রয়েছে সেগুলি হ'ল —

(১) ব্রিটেন একটি অত্যন্ত ক্ষুদ্র রাষ্ট্র। এখানে সেই অর্থে ধর্মীয়, জাতিগত ও ভৌগোলিক তারতম্য তেমন নেই। ফলে এখানে বহুদলীয় ব্যবস্থার অনুকূল পরিস্থিতি তৈরী হয়নি।

(২) ধর্মীয় সহনশীলতার কারণে ধর্মের ভিত্তিতে কোন দল ব্রিটেনে গড়ে উঠতে পারে নি।

(৩) ব্রিটেনের জনসাধারণ প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মতাদর্শ ও কর্মসূচীর প্রতি পুরোপুরি আস্থাশীল। এই কারণে তাঁরা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গীর অধিকারী তৃতীয় কোনও দলকে সমর্থনের পক্ষপাতী নন।

(৪) ব্রিটেনের দ্বিদলীয় ব্যবস্থা সরকারের স্থায়িত্ব বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। বহুদলীয় ব্যবস্থায় সরকার সাধারণতঃ স্বল্পস্থায়ী হয়।

(৫) বর্তমানে নির্বাচন অত্যন্ত ব্যয়বহুল হওয়ায় নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন হয়। তাছাড়া নির্বাচনে সাফল্য পাওয়ার জন্য ব্যাপক সাংগঠনিক শক্তি থাকা প্রয়োজন। ব্রিটেনের প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের এই অর্থবল ও সাংগঠনিক শক্তি থাকলেও অন্য কোন দলের তা নেই — যা তৃতীয় দল গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে।

(৬) কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি দ্বি-দলীয় ব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। পার্লামেন্টের কার্যপদ্ধতি সরকার এবং বিরোধীপক্ষের সম্মতির ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। এই সম্মতির ভিত্তিই হ'ল দ্বিদলীয় ব্যবস্থার মূল নীতি।

(৭) ব্রিটেনে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দল নিজেদের সকল শ্রেণীর কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলেছে। তারা বিভিন্ন স্বার্থ ও দৃষ্টিভঙ্গীর সমন্বয়ের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

(৮) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীল চরিত্র দ্বিদল ব্যবস্থার স্থায়িত্ব বৃদ্ধি করেছে। ইংরেজ জাতি তার রক্ষণশীলতার জন্য একবার কোন ব্যবস্থায় অভ্যস্ত হ'লে সহজে তা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহণ করে না। দলীয় ব্যবস্থার ক্ষেত্রেও এই ধারণা প্রযোজ্য।

(৯) গ্রেট ব্রিটেনের নির্বাচনী ব্যবস্থা দ্বিদল ব্যবস্থার উদ্ভব ও শক্তি বর্ধনে সহায়ক হয়েছে। পার্লামেন্টের প্রতিটি নির্বাচনী কেন্দ্র এক সদস্য বিশিষ্ট। সকল প্রার্থীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি ভোটপ্রাপ্ত প্রার্থীই নির্বাচিত হন। ফলে বেশির ভাগ নির্বাচনী কেন্দ্র থেকেই প্রধান দুটি দল রক্ষণশীল অথবা শ্রমিক দল জয়ী হয়। ফলে ছোট ছোট দলের প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার সম্ভাবনা হ্রাস পেয়েছে।

(১০) অনেক বিশেষজ্ঞের মতে রাষ্ট্রের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশরূপে সেখানকার বৃহৎ গণমাধ্যম বি. বি. সি. ব্যাপকভাবে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার সংহতিসাধনে সহায়ক হয়েছে। কারণ রাজনৈতিক প্রচারকার্যের জন্য বি. বি. সি. যে সময় ধার্য করে তার বেশির ভাগই শ্রমিক ও রক্ষণশীল দলের জন্য নির্ধারিত থাকে। কিন্তু অন্যান্য দলকে তেমন সুযোগ দেওয়া হয় না।

অনুশীলনী — ১

১। ঠিক অথবা ভুল লিখুন ঃ (☑ অথবা ☒ ব্যবহার করুন।)

(ক) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির নিবন্ধীকরণের কোন ব্যবস্থা নেই।

(খ) প্রায় দুশো বছর ধরে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল ছিল টোরি ও হুইগ দল।

(গ) ধর্মীয় সহনশীলতার কারণে ধর্মের ভিত্তিতে কোন দল ব্রিটেনে গড়ে উঠতে পারে নি।

১০০.৩.২ ব্রিটেনে দলীয় ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য

ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় যে সমস্ত বৈশিষ্ট্য আমাদের চোখে পড়ে সেগুলি হ'ল ঃ

(১) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা মূলতঃ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা। কেউ কেউ আবার এই দলীয় ব্যবস্থাকে সুস্পষ্ট দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বলে চিহ্নিত করতে চান। প্রথমে টোরী ও হুইগ, তারপর রক্ষণশীল ও উদারনৈতিক এবং বর্তমানে রক্ষণশীল ও শ্রমিক দলকেই কেবলমাত্র পর্যায়ক্রমে রাষ্ট্র পরিচালনা কার্যে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়।

(২) আইনগত স্বীকৃতির অভাব ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই আইনগত স্বীকৃতির অভাব সত্ত্বেও দলীয় ব্যবস্থা ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রবিন্দুতে অবস্থান করছে।

(৩) ব্রিটেনের দল ব্যবস্থায় প্রধান দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য তেমন নেই। অতএব দুটি দলের মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। এই বিরোধ না থাকার জন্যই কোন রাজনৈতিক দলই সমাজ-ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়।

(৪) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার চতুর্থ উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এখানকার দলগুলি প্রধানতঃ কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারাই পরিচালিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সংগঠনের হাতেই চরম ও চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে। এর ফলে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলির আঞ্চলিক সংগঠনগুলি দুর্বল হয়ে পড়েছে।

(৫) ব্রিটেনে দলীয় শৃংখলার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এখানে দলীয় নিয়ম শৃংখলাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করার প্রবণতা দেখা যায়। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে সাম্প্রতিক কালে ব্রিটেনের দলীয় শৃংখলার কঠোরতা যথেষ্ট পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে।

(৬) ব্রিটেনের কোনও দলই সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনে বৈপ্লবিক পদ্ধতি অনুসরণের পক্ষপাতী নয়। তাই তারা সাংবিধানিক উপায়ে ক্ষমতা দখল করতে চায় এবং ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায়।

(৭) গ্রেট ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা। ব্রিটেনের বিরোধীদল সরকারের সমালোচনা করলেও জাতীয় সংকটের সময় বিরোধী দল সবসময়ই সরকারের দিকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়। এমন কি পররাষ্ট্র সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ, কমনওয়েলথ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণ-এর ক্ষেত্রে সরকারী দল বিরোধী দলের সঙ্গে পরামর্শ করে। প্রবল জাতীয় সংকট, যেমন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, সে দেশে যে জাতীয় সরকার গঠিত হয়েছিল তাতে রক্ষণশীল ও শ্রমিক উভয় দলই একযোগে দেশশাসন ও প্রতিরক্ষার দায়িত্ব সামলেছে।

(৮) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থাকে প্রকৃত শ্রেণীভিত্তিক দলীয় ব্যবস্থা বলা যায় না। যেমন, রক্ষণশীল দলটি মূলতঃ সামন্ত শ্রেণী ও সমাজের বিত্তবান অংশের স্বার্থ সংরক্ষণ করলেও এই দলের সমর্থকদের শতকরা ৫৫ জন শ্রমিক শ্রেণীর। অন্যদিকে শ্রমিক দল ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় শ্রমিক শ্রেণীর স্বার্থ সংরক্ষণ করলেও এই দলের সমর্থকদের একটা বড় অংশ মধ্যবিত্ত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষ।

(৯) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থার আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রধান রাজনৈতিক দলসমূহ মূলত কর্মসূচীভিত্তিক দলে পরিণত হয়েছে। সাধারণ নির্বাচনের আগে প্রতিটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনী কর্মসূচী (ইশ্‌তেহার) রচনায় ব্যস্ত থাকে। নির্বাচক মন্ডলীর রায় যে দলের কর্মসূচীর অনুকূলে থাকে, সেই দলই সরকার গঠনের সুযোগলাভ করে।

(১০) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থায় প্রধান দলগুলি কর্মসূচীতে মধ্যপন্থা অবলম্বন করে, কোনও চরম পন্থা নয়। নির্বাচন কেন্দ্রিক দল বলেই তাদের পক্ষে এই মধ্যপন্থার নীতি অনুসরণ করা সম্ভব।

(১১) ব্রিটিশ দলীয় ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক দুর্নীতি ধীরে ধীরে প্রধান্য বিস্তার করছে। দুর্নীতির এই অভিযোগ দলীয় রাজনীতির বিশ্বাসযোগ্যতা হ্রাস করেছে।

(১২) ব্রিটেনের রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক গড়ে উঠেছে।

অনুশীলনী — ২

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা মূলত _____ ব্যবস্থা।

(খ) শক্তিশালী _____ _____ অস্তিত্ব ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

(গ) ব্রিটেনের দলীয় _____ ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ঘ) ব্রিটেনে _____ দল ও _____ গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

১০০.৩.৩ ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী

যখন একই রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী ও উদ্বুদ্ধ একদল মানুষ সংঘবদ্ধভাবে বা যৌথ প্রচেষ্টার মাধ্যমে তাঁদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংবিধান সম্মতভাবে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করে তখন সেই সংগঠিত জনসমষ্টিকেই রাজনৈতিক দল বলে চিহ্নিত করা হয়। রাজনৈতিক দলের সংজ্ঞা সম্পর্কিত এই বক্তব্য গ্রেট ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রেও সমানভাবে প্রযোজ্য।

ব্রিটেনে সংসদীয় শাসনব্যবস্থার রীতিনীতি অনুসারে রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী স্থির হয়।

(১) সরকারি ক্ষমতা দখল করা হ'ল রাজনৈতিক দলের প্রধান উদ্দেশ্য। ব্রিটেনের দুটি প্রধান দল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। যে দল নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সেই দল সরকার গঠন করে। অপর দলটি প্রধান বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে এবং সরকারের স্বৈরাচারী হওয়ার প্রবণতাকে রোধ করে।

(২) অতএব বলা যায় যে রাজনৈতিক দলগুলির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা। এই উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের সময় বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রার্থী মনোনয়ন করে এবং সেই মনোনীত প্রার্থীর জয়লাভের জন্য প্রচারকার্য চালায়।

(৩) অন্যান্য দেশের মত ব্রিটেনেও প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হ'ল নিজের অনুকূলে জনমত গঠন করা। নির্বাচনে প্রত্যেক দলই জাতীয় সমস্যা সম্পর্কে নিজ নিজ বক্তব্য নির্বাচকমন্ডলীর কাছে পেশ করে এবং তাদের সমর্থন দাবি করে।

(৪) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলি রাজনৈতিক শিক্ষা ও চেতনার বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সভা-সমিতি, পত্র-পত্রিকা বেতার ও দূরদর্শনের মাধ্যমে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি বিভিন্ন সমস্যা ও সমস্যার সমাধানের বিভিন্ন বিকল্প পন্থা জনগণের সামনে তুলে ধরে। ফলে জনগণ রাজনৈতিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পায়।

(৫) বর্তমানে অন্যান্য রাষ্ট্রের মত গ্রেট ব্রিটেনকেও বহু সমস্যার সম্মুখীন হ'তে হয়। তাদের মধ্যে রাজনৈতিক দলই গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাগুলি চিহ্নিত করে এবং সেই সমস্যা সমাধানের জন্য নিজের নিজের কর্মসূচি ঘোষণা করে।

(৬) অন্যান্য আধুনিক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মত ব্রিটেনেও সরকার ও জনসাধারণের মধ্যে সংযোগ রক্ষার দায়িত্ব পালন করে রাজনৈতিক দল।

(৭) গ্রেট ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় যেহেতু আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল সরকার গঠন করে

সেহেতু শাসনবিভাগ ও আইনবিভাগের মধ্যে এখানে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে। সুতরাং বলা যায় যে রাজনৈতিক দলই ব্রিটেনে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে সমন্বয় সাধনের দায়িত্ব পালন করে।

(৮) রাজনৈতিক দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হ'ল গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ভিন্নমুখী অজস্র চাপের মধ্যে সমন্বয়সাধন করা। গ্রেট ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল বিভিন্ন স্বার্থের সমন্বয় সাধনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে।

অনুশীলনী — ৩

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) বর্তমানে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল _____ ও _____ দল।

(খ) ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি _____ ও _____ বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় _____ বিভাগ ও _____ বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

(ঘ) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় _____ ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দল।

১০০.৪ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার আধুনিকতম বিকাশ বলে বিবেচিত হয়। শ্রেণী-অঞ্চল-পেশা-ধর্মবিশ্বাস ইত্যাদি নানা কারণে বিশ্লিষ্ট সমাজের বিভিন্ন গোষ্ঠী যখন আলাদাভাবে তাদের দাবিদাওয়া আদায়ের জন্য সক্রিয় হয়ে ওঠে তখন সৃষ্টি হয় চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির। অনেকে এইরূপ গোষ্ঠীগুলিকে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলে অভিহিত করার পক্ষপাতী। অ্যালমন্ড (Almond) ও পাওয়েল (Powell) বলেন যে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বলতে আমরা নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ অথবা সুযোগ সুবিধা দ্বারা সংযুক্ত এমন একটি ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝি যারা এরূপ বন্ধন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন। এইচ. জিগলার (H. Zeigler)-কে অনুসরণ করে বলা যায় যে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টিকে বোঝায় যার সদস্যবর্গ সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করেও সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। অর্থনৈতিক, ধর্মীয়, বৃত্তিগত প্রভৃতি স্বার্থের ওপর ভিত্তি করে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি গড়ে ওঠে। গোষ্ঠীস্বার্থ রক্ষা করাই এইসব গোষ্ঠীর মুখ্য উদ্দেশ্য। শ্রমিক সংঘ, শিক্ষক সংঘ, কৃষক সমিতি, বণিক সভা প্রভৃতি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর উদাহরণ।

বর্তমানে উদারনৈতিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রভাব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই ব্রিটিশ রাজনীতি ও রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ভালোভাবে বুঝতে গেলে এই চাপ সৃষ্টিকারী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ ভালোভাবে বিশ্লেষণ করা দরকার।

১০০.৪.১ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা

গ্রেট ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্ধারকের ওপর নির্ভরশীল। প্রথমত, ব্রিটেনে এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা প্রচলিত। ফলে এখানে কেন্দ্রিয় সরকারের হতেই গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় সমস্যার বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। এই কারণে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের পর্যায়েই নিজেদের কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখে।

দ্বিতীয়ত, ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। বস্তুতঃ ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল ও চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর মধ্যে পার্থক্য স্পষ্ট উল্লেখ করা সম্ভব নয়। প্রতিটি দলই বিভিন্ন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রতি পৃষ্ঠপোষকতা প্রদর্শন এবং তাদের উদ্ভবে সাহায্য করে। শ্রমিক ও রক্ষণশীল প্রতিটি দলেরই নিজস্ব গণসংগঠন আছে। এইসব গণসংগঠনই নির্বাচনে দলের হয়ে প্রচারকার্য পরিচালনা, অর্থসংগ্রহ ও সদস্য সংগ্রহে সাহায্য করে। ব্রিটেনে বিভিন্ন শ্রমিক সঙ্ঘই শ্রমিকদলের শক্তির মূল ভিত্তি। শ্রমিক দল নিজেকে শ্রমিক আন্দোলনের একটা অংশরূপে গণ্য করে। প্রকৃতপক্ষে শ্রমিক আন্দোলন থেকেই এই দলের উদ্ভব ঘটেছে। ১৯০০ সালে এই দল গঠিত হয়। গঠন ও কার্যকলাপের দিক থেকে শ্রমিকদলের ভূমিকা দু-ভাগ — একভাগ স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী এবং আর একভাগ রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

তৃতীয়ত, রাজনৈতিক সংস্কৃতি ব্রিটেনে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণকারী একটি উপাদান। এখানে অনেক স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী রাজনৈতিক সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্ম না হলেও সকল গোষ্ঠীকেই বিদ্যমান রাজনৈতিক মূলবোধ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর মধ্যে থেকে কার্য পরিচালনা করতে হয়। প্রচলিত ব্যবস্থায় মূল্যবোধ এবং কাঠামোর প্রতি আনুগত্য গোষ্ঠীসমূহের কার্যকলাপের অনুমোদনের ভিত্তিকে শক্তিশালী করে।

চতুর্থত, চাপসৃষ্টিকারী অথবা স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠীসমূহ উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করে না। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেই তারা সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করার উদ্যোগ নেয়। গোষ্ঠীর দাবি ব্যাপক রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করবে কি না তা নির্ভর করে তার রাজনৈতিক সংস্কৃতিক মূল্যবোধের ওপর। বস্তুতঃ কোন স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর দাবি তখনই রাজনৈতিক সমর্থন লাভ করে যখন তার দাবির সঙ্গে রাজনৈতিক সংস্কৃতির মূল্যবোধের সুসঙ্গতি গড়ে ওঠে। কোনও গোষ্ঠীর লক্ষ্য যত বেশী সাধারণ সাংস্কৃতিক মানের সঙ্গে সঙ্গতিসম্পন্ন হবে সেই গোষ্ঠী তত বেশি নিজের স্বার্থকে জাতীয় স্বার্থের সমার্থক ঘোষণা করতে সক্ষম হবে। রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক

মূল্যবোধের সঙ্গে বিরোধ যত বেশি হবে গোষ্ঠীর লক্ষ্যপূরণে ততই প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হবে। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ কিভাবে প্রভাব বিস্তার করবে তা অবশ্য নির্ভর করে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের ওপর। বিশেষত নির্বাচনের প্রেক্ষিতে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সংখ্যাগত ব্যাপ্তি কিংবা কোনো বিশেষ এলাকার মানুষের সঙ্গে একাত্মতা তাদের রাজনৈতিক প্রভাব নির্ধারণ করে। সংবাদ মাধ্যমও কিভাবে এদের বক্তব্যকে গুরুত্ব দিচ্ছে সেটিও অন্যতম নিয়ামক।

১০০.৪.২ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর শ্রেণীবিভাগ

গ্রেট ব্রিটেনে কার্যকরী গোষ্ঠীগুলিকে ব্যাপকভাবে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় — অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (Economic Groups) এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয় এমন সব গোষ্ঠী (Non-economic Groups)

অর্থনৈতিক গোষ্ঠীগুলি নানাবিধ পেশা, জীবিকা এবং ব্যবসায়ে জড়িত সমস্বার্থভিত্তিক ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত হয়। এইসব গোষ্ঠীর লক্ষ্য হ'ল সদস্যদের অর্থনৈতিক স্বার্থ সংরক্ষণ। যেমন শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, চিকিৎসক প্রভৃতি পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তিদের স্বতন্ত্র সংগঠন আছে। শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আরও বিস্তারিতভাবে বলা যায় যে শিল্প, কৃষিখামার, সরকারী ও বেসরকারী ক্ষেত্রে শ্রমিক কর্মচারীদের সংগঠন আছে। আবার শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদেরও নিজস্ব গোষ্ঠী আছে। গ্রেটব্রিটেনে অর্থনৈতিক গোষ্ঠী ও তাদের সদস্যসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। শ্রমিক ও মালিক সঙ্ঘের সদস্য সংখ্যাও ক্রমবর্ধমান।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে অর্থনৈতিক গোষ্ঠীসমূহ কেবল মজুরী, বেতন অথবা মুনাফা সম্পর্কিত বিষয় নিয়েই আলোচনা করে না, অর্থনৈতিক সমস্যা সম্পর্কেও তারা সচেতন থাকে। সরকারের অর্থনৈতিক নীতি, কর-ব্যবস্থা, শিল্প সম্পর্কিত নীতি, আমদানি-রপ্তানি নীতি ইত্যাদি বিষয়ে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নিজেদের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। ব্রিটেনে আইনগত দিক থেকে সরকার শিল্পপতিদের নিয়ন্ত্রণ করে, আবার শিল্পপতিরাও সরকারকে প্রভাবিত করে। সরকারের কাছে শিল্পপতিদের পরামর্শ একান্ত জরুরী। পরামর্শ বলতে বোঝায় বিভিন্ন ধরনের তথ্য ও পরিসংখ্যান সরবরাহ। এখানে গোষ্ঠীগুলি এখন এত শক্তিশালী যে তারা অনুমোদন না করলে সরকারের অর্থনৈতিক নীতি ও কর্মসূচীর বাস্তব রূপায়ণ সম্ভব নয়।

ব্রিটেনে অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে যুক্ত নয় এমন গোষ্ঠীর সংখ্যাও অনেক। হার্ভে ও বাথার তাদের মোট পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন।

(১) এমন কিছু গোষ্ঠী আছে যাদের লক্ষ্য হ'ল সামাজিক আচার-আচরণ ও নীতি সম্পর্কে আদর্শ স্থাপন। রয়্যাল সোসাইটি ফর দ্য প্রিভেনশন্ অব্ ক্রুয়েলটি টু অ্যানিম্যাল এই ধরনেরই একটি গোষ্ঠী।

(২) ধর্মীয় ও নৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠী আছে। যেমন দ্য লর্ডস ডে অবজারভেন্স সোসাইটি।

(৩) শিক্ষা, আমোদপ্রমোদ এবং সাংস্কৃতিক উন্নয়নের স্বার্থে দ্য কাউন্সিল ফর দ্য প্রিজারভেশন অব্ রুরাল ইংল্যান্ড গঠিত হয়েছে।

(৪) বিশেষ অংশের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য বিশেষ ধরনের গোষ্ঠী গঠিত হয়। দ্য অটোমোবাইল অ্যাসোসিয়েশন এই শ্রেণীভুক্ত।

(৫) পরিচালন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত গোষ্ঠীর অবস্থান গ্রেট ব্রিটেনের গোষ্ঠী-রাজনীতির একটি বিশিষ্ট দিক। উদাহরণ হিসেবে দ্য অ্যাসোসিয়েশন অব্ মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনস্-এর উল্লেখ করা যায়।

১০০.৪.৩ চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব

গ্রেট ব্রিটেন এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র। জাতীয় স্তরে সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত। সুতরাং জাতীয় ভিত্তিতে গঠিত গোষ্ঠীসমূহ কেন্দ্রীয় সরকারের স্তরে কার্যাবলী সীমাবদ্ধ রাখে। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের হাতে আঞ্চলিক স্বার্থসম্বলিত কার্যাবলী পরিচালনার দায়িত্ব থাকে। আঞ্চলিক গোষ্ঠীসমূহ সেই কারণেই আঞ্চলিক স্তরে কাজ করে।

কোনও কোনও গোষ্ঠী নির্বাচকমন্ডলী, রাজনৈতিক দল, আইনসভা এবং শাসনবিভাগীয় স্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের মূল দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে শাসনবিভাগের ওপর। শাসনবিভাগ বলতে মন্ত্রী এবং আমলাদের বোঝায়। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী মন্ত্রীদের প্রভাবিত করতে চেষ্টা করে। আমলারাও নীতি গ্রণয়ন ও আইনের খসড়া তৈরীর ব্যাপারে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করে। এই কারণে স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহ আমলাতন্ত্রের পর্যায়েও কাজ করে।

হার্ভে এবং বাথারের মতে প্রাত্যহিক কার্য পরিচালনার জন্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীসমূহ সরকারী দপ্তর এবং সংস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করে। এই গোষ্ঠীগুলি সরকারের কাছে তাদের দাবি পেশ করে এবং অন্যদিকে সরকার গোষ্ঠীগুলিকে প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্ট থাকে।

পার্লামেন্ট পর্যায়েও এই চাপসৃষ্টিকারী অথবা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর কার্যাদি পরিচালিত হয়। পার্লামেন্টের সদস্যরা বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থের সঙ্গে জড়িত থাকেন। প্রধান প্রধান রাজনৈতিক দলের সঙ্গে বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর যোগ থাকে।

চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর ভূমিকাকে বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে সমালোচনা করা হয়। একথা বলা হয় যে সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে তারা বৃহত্তর জাতীয় স্বার্থের প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে। দল ও সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে তারা গোষ্ঠীগত স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য সচেষ্ট

থাকে। তবে এজন্য স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর ভূমিকা অবহেলার নয়। এই গোষ্ঠীগুলি সমাজের বিভিন্ন পেশা ও স্বার্থের সঙ্গে জড়িত মানুষের দাবি ও অভিযোগ সংগ্রহ করে সরকারের কাছে পেশ করে। এইভাবে সাধারণ নাগরিক সমাজের বিভিন্ন অংশের সমস্যা সম্পর্কে অবহিত হওয়ার সুযোগ পায়। এক কথায় বলা যায় বর্তমানে গ্রেট ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

অনুশীলনী — ৪

১। **একটি অথবা দুটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ**

(ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী কাকে বলে ?

(খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর কয়েকটি উদাহরণ দিন।

(গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায়?

(ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি সমাজের কোন কোন স্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে ?

১০০.৫ সারাংশ

ব্রিটেনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা পর্যালোচনা করলে আমরা দেখতে পাই যে এখানে দ্বিদলীয় ব্যবস্থা বর্তমান যা সংসদীয় গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য। এই দল দুটি হল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল। এই দুটি দলের একটি দল সরকার গঠন করে আর একটি দল বিরোধী দল হিসেবে কাজ করে।

ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলব্যবস্থার কোন আইনগত স্বীকৃতি নেই। সংবিধানের কোন ধারা অথবা আইনসভা প্রণীত কোন আইনের মাধ্যমে দলীয় ব্যবস্থা গড়ে ওঠেনি।

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলগুলি বিপ্লবে বিশ্বাস করে না। এখানে দলীয় শৃংখলার ওপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

রাজনৈতিক দলগুলির পাশাপাশি চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি ব্রিটেনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক। তবে এই স্বার্থন্বেষী বা চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীসমূহ উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করে না। নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মূল্যবোধ এবং প্রতিষ্ঠানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত পরিবেশেই তারা সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করার উদ্যোগ নেয়।

১০০.৬ সর্বশেষ অনুশীলনী

১। ব্রিটেনের দলব্যবস্থার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

২। ব্রিটেনের চারটি রাজনৈতিক দলের নাম লিখুন।

৩। **ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার স্থায়িত্বের কারণ কী ?**

৪। **ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত পার্থক্য আছে কী ?**

৫। **ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের কার্যাবলী উল্লেখ করুন।**

৬। চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের যোগাযোগ কতটুকু ?

১০০.৭ উত্তরমালা

অনুশীলনী — ১

১। (ক) — ☑ , (খ) — ☑ , (গ) — ☑ ।

অনুশীলনী — ২

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) ব্রিটেনের দলীয় ব্যবস্থা মূলতঃ দ্বিদলীয় ব্যবস্থা।

(খ) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব ব্রিটিশ দল ব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য।

(গ) ব্রিটেনে দলীয় শৃংখলার উপর প্রভূত গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

(ঘ) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল ও স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠীর মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।

অনুশীলনী — ৩

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) বর্তমানে ব্রিটেনের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দল রক্ষণশীল দল ও শ্রমিক দল।

(খ) ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলি শিক্ষা ও চেতনা বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

(গ) ব্রিটেনের সংসদীয় ব্যবস্থায় আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের মধ্যে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকে।

(ঘ) ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থায় সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করে রাজনৈতিক দল।

অনুশীলনী — ৪

১। **একটি অথবা দুটি বাক্যে উত্তর দিন ঃ**

(ক) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বলতে এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টিকে বোঝায় যার সদস্যবর্গ সরকার পরিচালনায় অংশগ্রহণ না করেও সরকারী সিদ্ধান্তগ্রহণ ব্যবস্থাকে প্রভাবিত করার জন্য সচেষ্ট হয়। এই গোষ্ঠীগুলির উদ্দেশ্য গোষ্ঠীস্বার্থ সংরক্ষণ করা, সরকারী ক্ষমতা হস্তগত করা নয়।

(খ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর উদাহরণ হল শ্রমিক সংঘ, শিক্ষক সংঘ, কৃষক সমিতি, বণিক সভা প্রভৃতি।

(গ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলিকে মূলতঃ দুটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় — অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (Economic Groups) এবং অর্থনৈতিক স্বার্থের সঙ্গে জড়িত নয় এমন সব গোষ্ঠী (Non-economic Groups)

(ঘ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলি নির্বাচকমন্ডলী, — রাজনৈতিক দল, আইনসভা ও শাসন বিভাগীয় স্তরে প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে।

সর্বশেষ অনুশীলনী ঃ

১। ব্রিটেনের দলব্যবস্থার কতকগুলি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হ'ল — (ক) দ্বিদলীয় ব্যবস্থা, (খ) আইনগত স্বীকৃতির অভাব, (গ) মতাদর্শগত পার্থক্যের অভাব, (ঘ) শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সংগঠনের অস্তিত্ব, (ঙ) কঠোরভাবে নিয়মশৃংখলা অনুসরণ করার প্রবণতা, (চ) চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর সঙ্গে রাজনৈতিক দলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, ইত্যাদি ।

২। ব্রিটেনের চারটি রাজনৈতিক দল হল — (ক) রক্ষণশীল দল, (খ) শ্রমিক দল, (গ) উদারনৈতিক দল এবং (ঘ) সোস্যাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি।

৩। ব্রিটেনে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার স্থায়িত্বের পেছনে যে কারণগুলি আছে, সেগুলির হ'ল—(ক) ইংরেজ জাতির রক্ষণশীলতা, (খ) আঞ্চলিক দলের সুযোগ না থাকা, (গ) দুটি রাজনৈতিক দলের মধ্যে মতাদর্শ ও কর্মসূচির ক্ষেত্রে পার্থক্যের অভাব, (ঘ) কোন দলই পুরোপুরি শ্রেণীভিত্তিক না হওয়া, (ঙ) নির্বাচন পদ্ধতি, (চ) কমন্সসভার কার্যপদ্ধতি, (ছ) সংসদীয় গণতন্ত্রে দ্বিদলীয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা।

৪। ব্রিটেনে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতাদর্শগত কোন পার্থক্য নেই। তাই রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে কোন মৌলিক বিরোধ নেই। এই বিরোধ না থাকার জন্য কোন রাজনৈতিক দলই সমাজব্যবস্থার আমূল পরিবর্তনের পক্ষপাতী নয়। রাজনৈতিক দলগুলি মোটামুটি একই শ্রেণীস্বার্থের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রশ্নে তারা মোটামুটি একই মত পোষণ করে।

৫। ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের কাজ হ'ল — (ক) সরকারি ক্ষমতা দখল করা, (খ) সমস্যা নির্বাচন করা, (গ) নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা, (ঘ) জনমত গঠন করা, (ঙ) সরকার ও জনগণের মধ্যে সংযোগ রক্ষকরা, (চ) রাজনৈতিক ব্যবস্থার স্থায়িত্ব রক্ষা করা, (ছ) রাজনৈতিক শিক্ষা ও

চেতনার বিস্তার ঘটানো, (জ) সরকারের স্বৈরাচারিতা রোধ করা ইত্যাদি।

৬। ব্রিটেনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির সঙ্গে সেখানকার রাজনৈতিক দলসমূহের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ লক্ষ্য করা যায়। এখানকার প্রতিটি রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতায় বিভিন্ন চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে। সেই কারণে এই গোষ্ঠীগুলি যে রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় রয়েছে, সেই রাজনৈতিক দলের অনুকূলে জনমতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তাছাড়া এখানকার রাজনৈতিক দলগুলির উত্থানপতনে চাপসৃষ্টিকারী গোষ্ঠীগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে।

১০০.৮ গ্রন্থপঞ্জী

১। *T. Brennan* — Politics and Government in Britain, Cambridge University Press – 1972.

২। *সত্যসাধন চক্রবর্তী ও নির্মলকান্তি ঘোষ* — তুলনামূলক আধুনিক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি, শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৯৩।

৩। *অধ্যাপক সুদর্শন ভট্টাচার্য* — প্রশ্নোত্তরে তুলনামূলক শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি; (দ্বিতীয় খন্ড) :, ইন্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ, প্রথম সংস্করণ : আগস্ট, ২০০০।

ই. পি. এস. - ৭
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের
ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়
২৬

একক ১০১ ❑ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মূল নীতিসমূহের উদ্ভব (সংশোধনসহ)

গঠন

১০১.০ উদ্দেশ্য

১০১.১ প্রস্তাবনা

১০১.২ ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সংবিধান রচনা ও গ্রহণ

১০১.৩ সংবিধানের সম্প্রসারণ বা বিকাশ

১০১.৪ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১০১.৫ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

১০১.৬ বৃটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনা

১০১.৭ সারাংশ

১০১.৮ প্রশ্নাবলী

১০১.৯ উত্তরমালা

১০১.১০ গ্রন্থপঞ্জী

১০১.০ উদ্দেশ্য

এই এককের উদ্দেশ্য হল আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানের পদ্ধতি, বৈশিষ্ট্য ও বিবর্তন সম্বন্ধে আপনাদের অবহিত করা। এককটি পাঠ করলে আপনি জানতে পারবেন —

- মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্মগ্রহণের পটভূমি ;
- মার্কিন সংবিধান রচনা ও গ্রহণের বৃত্তান্ত;
- মার্কিন সংবিধানের সম্প্রসারণ ;
- মার্কিন সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ ;
- মার্কিন সংবিধানের পদ্ধতি ও সংবিধানের সংশোধনসমূহ।

এগুলি সম্বন্ধে অবহিত হলে আপনি আমেরিকার শাসনব্যবস্থার মূল নীতিগুলির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

১০১.১ প্রস্তাবনা

এই এককে আমরা আমেরিকার সংবিধানের ঐতিহাসিক পটভূমিকার ভিত্তিতে সংবিধান রচনা ও গ্রহণ, সংবিধানের সম্প্রসারণ, সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ এবং সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি আলোচনা করব। তা ছাড়াও ব্রিটেন ও আমেরিকার সংবিধানের তুলনার ভিত্তিতে আমেরিকার সংবিধানকে বোঝার চেষ্টা করব।

সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন আমেরিকায় ১৩টি উপনিবেশ গড়ে তোলে এবং ১৭৬৩ থেকে নানারকম কর ও দমনমূলক ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রিটেনের বাণিজ্যিক স্বার্থ সংরক্ষণের চেষ্টা করে। ফলে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থ ক্ষুন্ন হয়। তেরটি উপনিবেশেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। ব্রিটিশ সরকারের বলপ্রয়োগ নীতি ও শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে ১৭৭৫ সালে উপনিবেশবাদীদের যুদ্ধ শুরু হয়। ৪ঠা জুলাই, ১৭৭৬ সালে ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণা করা হয়। ১৭ই নভেম্বর ১৭৭৭ সালে ১৩টি উপনিবেশ মিলে রাষ্ট্র সমবায় (Confeeration) গঠন করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার উপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা মেনে নেয় না। শেষে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে যুদ্ধে ১৭৮৩ সালে আমেরিকার উপনিবেশগুলি জয়লাভ করে স্বাধীনতা লাভ করে।

রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্যে অনৈক্য ও নানা অসুবিধা দেখা দেওয়ায় ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির একটি কনভেনশনে নতুন সংবিধান গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ১৭৮৯ সালে নতুন সংবিধান গৃহীত হয়। সংবিধানটি ছিল ক্ষুদ্র। তাতে প্রস্তাবনাসহ সাতটি অনুচ্ছেদ ছিল। কালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সংবিধানেরও পরিবর্তন ঘটেছে। সংবিধান সংশোধনব্যবস্থা, সুপ্রীম কোর্টের রায়, কংগ্রেস প্রণীত আইন, প্রথা ও রীতিনীতি এবং রাষ্ট্রপতিদের শাসনবিভাগীয় ভূমিকার মাধ্যমে সংবিধানটি ধীরে ধীরে বিকাশ লাভ করে বর্তমান রূপ পেয়েছে।

১৭৮৯-এর আমেরিকার সংবিধান জনগণের সার্বভৌমত্ব, লিখিত শাসনতন্ত্র, দুষ্পরিবর্তনীয়তা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি, রাষ্ট্রপতির শাসন, জনগণের মৌলিক অধিকার, বিচারবিভাগের প্রাধান্য, যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি, দ্বৈত নাগরিতা, রাজ্যগুলির সমতা ও স্বতন্ত্র সংবিধান, দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা, সীমাবদ্ধ শাসন ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যযুক্ত ছিল। সংবিধান সংশোধনের ব্যবস্থাও সংবিধানে লিখিত আছে। আমেরিকার সংবিধান সংশোধন ব্যবস্থাটি জটিল ও কষ্টসাধ্য, তাই আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয়।

ব্রিটেন ও আমেরিকা দুটি উদারনীতিবাদী ধনতান্ত্রিক দেশ। দুটি দেশেই গণতন্ত্র, দ্বিকক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা, জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার ও দ্বিদল ব্যবস্থা আছে। কিন্তু প্রকৃতিগত দিক থেকে আমেরিকার শাসনব্যবস্থা রাষ্ট্রপতিশাসিত ও যুক্তরাষ্ট্রীয়, আর ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা সংসদীয় ও এককেন্দ্রিক। তাই উভয় দেশের শাসনব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখা যায়।

১০১.২ ঐতিহাসিক পটভূমিকা এবং সংবিধান রচনা ও গ্রহণ

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুশ বছরের কিছু বেশি ইতিহাসে দেশটি বিশ্বে তার মর্যাদা ও প্রতিপত্তি সন্দেহাতীতভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ প্রসঙ্গে মার্কিন শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতির গুরুত্ব অনস্বীকার্য। মার্কিন শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি ঠিকভাবে অনুধাবন করার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঐতিহাসিক পটভূমিকা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উত্তরে কানাডা, দক্ষিণে মেক্সিকো ও মেক্সিকো উপসাগর, পূর্বদিকে আটলান্টিক মহাসাগর এবং পশ্চিমে প্রশান্ত মহাসাগর। সমগ্র দেশ জুড়ে আছে উঁচু উঁচু পাহাড়, বিস্তৃত উপত্যকা, বড় বড় নদনদী এবং উর্বর সমভূমি। খনিজ ও প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটি সমৃদ্ধ। জাতিগতভাবে মার্কিনীরা বৈচিত্র্যপূর্ণ। বিভিন্ন জাতির জীবনধারা ও ঐতিহ্যের মিলনে মার্কিনীদের উদ্ভব। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে অভিবাসীদের দেশ বলা হয়। এখানে বহু ভারতীয় উপজাতি, স্ক্যানিনেভিয়ার ভাইকিংস উপজাতি ও স্পেনীয়রা বসবাস করছেন। ইংল্যাণ্ড, হল্যাণ্ড ও ইউরোপের পশ্চিমাঞ্চলের বিভিন্ন দেশ থেকে এই অঞ্চলে বহু মানুষ আসেন। বিভিন্ন জাতির ঐতিহ্য ও জীবনধারার মধ্যে ব্রিটিশ সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব মার্কিনীদের ওপর সব থেকে বেশি।

ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যস্থাপনে ইংল্যাণ্ড প্রথম পদক্ষেপ নেয় ১৫৭৮ সালে। ঐ সময় স্যার হামফ্রী হিঙ্গলবার্টকে ইংল্যাণ্ডের রাণী দূরবর্তী ও আদিম অঞ্চলে বসবাস ও ঐসব স্থান দখল করার অনুমতি দেন। দুবছর পর ইংল্যাণ্ডের রাণী সেন্ট লরেন্স নদী ও ফ্লোরিডার মধ্যবর্তী অঞ্চলটিকে ইংরেজদের বসতিস্থাপনের জন্য নির্দিষ্ট করে ওই অঞ্চলের নাম দেন ভার্জিনিয়া। ঐ অঞ্চলে বসতিস্থাপনের দায়িত্ব দেন ওয়াল্টার র‍্যালের হাতে। আমেরিকায় বসতিস্থাপনের জন্য ইংরেজ ব্যবসায়ীরা উদ্যোগী হয়। ইউরোপে চার্চের সঙ্গে যাদের বিরোধ হয়েছিল তারাও উত্তর আমেরিকায় তাদের ধর্মাচরণের স্বাধীনতা থাকবে বলে সেখানে যেতে শুরু করেন। ১৬০৬ সালে ব্রিটেনের রাজা জেমস্ প্লাইমাউথ ও লণ্ডন কোম্পানীকে আমেরিকার বিশেষ কয়েকটি স্থানে বসতিস্থাপনের অধিকার দেন। ১৬২০ সালে কিছু পিলগ্রিম (ধর্মীয় ভেদবাদী), ১৬৩৪ সালে একদল ক্যাথলিক এবং ১৬৮২ সালে কোয়েকাররা যথাক্রমে ম্যাসাচুসেটস, মেরীল্যান্ড ও পেনসিলভ্যানিয়ায় উপস্থিত হয়। ১৭০০ সালের মধ্যে ম্যাসাচুসেটস থেকে ক্যারোলিনা পর্যন্ত সমগ্র অঞ্চলে ইংরেজদের জনপদ গড়ে ওঠে। ইংলণ্ড থেকে আসা অধিবাসীদের মাধ্যমে ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান, অভিজ্ঞতা, চিন্তাধারা, আইন ইত্যাদি আমেরিকার ভূখণ্ডে বাহিত হয়ে আসে।

শুরুতে উপনিবেশগুলির শাসনব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের ব্যবসায়ী ও রাজার প্রিয় ব্যক্তিদের হাতে ন্যস্ত ছিল। তারা রাজার ফরমান অনুসারে উপনিবেশগুলিতে স্বায়ত্বশাসন প্রতিষ্ঠা করেছিল। ১৩টি উপনিবেশের সবগুলিতেই আইনসভা দ্বারা আইন প্রণীত হত। কানেক্‌টিকাট রোড আইল্যাণ্ড তাদের গভর্ণরকেও নির্বাচিত করত। তবে অন্যগুলিতে রাজাই গভর্ণরদের নিয়োগ করতেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই

ইংল্যান্ডের রাজার প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ থাকত। অষ্টাদশ শতকের শেষ দিকে (১৭৬৩) স্পেন ও ফ্রান্স হটে যাবার পর ইংল্যাণ্ডের স্বার্থের যূপকাষ্ঠে আমেরিকার বাণিজ্যিক স্বার্থকে বলি দেওয়া শুরু হয়। সেখানে নানারকম কর বসিয়ে ইংল্যাণ্ডের কোষাগার বৃদ্ধির চেষ্টা চলে। ১৩টি উপনিবেশেই প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। তারা জানায় যে উপনিবেশগুলিতে করধার্যের ক্ষমতা শুধু সেখানকার আইনসভাগুলিই ভোগ করে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার নতুন কর বসাতে থাকলে সর্বত্র ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৭৭০ সালে বোস্টন শহরে ব্রিটিশ সৈন্যের সঙ্গে ঔপনিবেশিকদের সংঘর্ষ শুরু হয়। ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণমূলক আইন ও আর্থিক নীতি ঔপনিবেশের ব্যবসায়ীদের স্বার্থবিরোধী ছিল। মাতৃভূমি ব্রিটেনের সঙ্গে ১৩টি উপনিবেশের সম্পর্ক তিক্ত হয়ে দাঁড়ায়। নিজেদের অধিকার সম্বন্ধে তারা সচেতন হতে থাকে।

১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়াতে প্রথম মহাদেশীয় কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। ভার্জিনিয়ার জর্জ ওয়াশিংটন ও প্যাট্রিক হেনরী, মাস্যাচুসেটসের জর্ন ও সামুয়েল আডামন ইত্যাদি ৫৬ জন প্রতিনিধি এই কংগ্রেসে যোগ দেন। এখানে ব্রিটিশ সরকারের দমনমূলক আইন ও রাজস্বসংক্রান্ত নিয়মনীতির নিন্দা করা হয় এবং বলা হয় যে শুধুমাত্র প্রাদেশিক আইনসভাগুলিই তাদের নিজেদের সম্বন্ধে আইনপ্রণয়নের অধিকারী।

ব্রিটিশ সরকার দমনমূলক শুল্কব্যবস্থা ও বলপ্রয়োগ নীতির পরিবর্তন না করায় ১৭৭৫ সালে ফিলডেলফিয়ায় দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস শুরু হয়। এতে বেঞ্জামিন ফ্র্যাঙ্কলিন, উইলসন, জেফারসন ইত্যাদি নেতারা যোগ দেন। অবশ্য কিছু রক্ষণশীল নেতা এতে যোগ দেননি।

দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অল্পদিন আগেই উপনিবেশবাসীদের সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ শুরু হয়। উপনিবেশগুলির সামরিক বাহিনীর অধ্যক্ষ পদে জর্জ ওয়াশিংটনকে নিযুক্ত করা হয়। দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেস ১৪ মাস ধরে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করা হয় নি।

১৭৬৩ থেকে গ্রেট ব্রিটেনের বিরুদ্ধে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলেও ১৭৭৫ এর আগে পর্যন্ত সব ঔপনিবেশিকদেরই লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে থেকে নিজেদের অবস্থার উন্নতি সাধন। গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে সমঝোতায় আসাই ছিল তাঁদের লক্ষ্য। কিন্তু তাদের ন্যায্য দাবীগুলিকে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন মেনে না নেওয়ায় শেষ পর্যন্ত উপনিবেশগুলির জনগণ স্বাধীনতা ঘোষণার দাবী তোলে। ১৭৭৫ সালে লেক্সিংটন যুদ্ধের পর তারা ব্রিটেনের সঙ্গে সবরকম সম্পর্ক ছিন্ন করার কথা ঘোষণা করে। রক্ষণশীল নেতারা ঔপনিবেশগুলির স্বাধীনতা ঘোষণা ও ব্রিটেনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার বিরোধী ছিলেন। তাদের সঙ্গে স্বাধীনতাকামীদের সর্বত্র যুদ্ধ চলে।

১৭৭৬ সালের ৭ই জুন দ্বিতীয় মহাদেশীয় কংগ্রেসে ঔপনিবেশগুলির স্বাধীনতার দাবি সম্পর্কিত প্রস্তাব সমর্থিত হয়। ১০ই জুন স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের খসড়া রচনার জন্য কমিটি গঠিত হয়। এই

কমিটি ২৮ শে জুন রিপোর্ট পেশ করে এবং ৪ঠা জুলাই ঐতিহাসিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র চূড়ান্তভাবে স্বাক্ষরিত হয়।

১৭৭৭ সালের ১৭ই নভেম্বর ১৩টি উপনিবেশ চুক্তির মাধ্যমে ঐক্যবদ্ধ হয়ে একটি রাষ্ট্রসমবায় গঠন করে। ১৭৮১ সালে চুক্তিপত্রটি বিভিন্ন রাষ্ট্রগুলি অনুমোদন করে। চুক্তিপত্র অনুসারে রাষ্ট্রসমবায়ের পরিচালনার জন্য মহাদেশীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসই আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। শেষ পর্যন্ত ১৭৮৩ সালে আমেরিকার উপনিবেশগুলি স্বাধীনতা লাভ করে।

রাষ্ট্র-সমবায়ের সংবিধান অনুসারে মহাদেশীয় কংগ্রেসের মুখ্য দায়িত্ব ছিল রাষ্ট্র-সমবায়ের পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তিস্থাপন, সন্ধিচুক্তি সম্পাদন, সেনাবাহিনী গঠন, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার সুদৃঢ়করণ ইত্যাদি। সংবিধান অনুসারে বিচারকাজ পরিচালনার জন্য একটি সুপ্রীম কোর্ট স্থাপিত হয়।

রাষ্ট্র-সমবায়ের কিছু কাঠামোগত দুর্বলতা ছিল। করধার্য, ঋণগ্রহণ, ব্যবসা-বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি বিষয়ে রাষ্ট্র-সমবায়ের কোন ক্ষমতা ছিল না। ফলে রাষ্ট্র-সমবায় ও মহাদেশীয় কংগ্রেসকে বহু পরিমাণে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির ওপর নির্ভর করতে হত। কিন্তু রাষ্ট্রগুলি নিজেদের স্বাতন্ত্র্য ও কর্তৃত্বের ব্যাপারে সচেতন ছিল। তাদের মধ্যে পরিপূর্ণ ঐক্যের অভাবে রাষ্ট্র-সমবায়কে নানা অসুবিধায় পড়তে হত।

রাষ্ট্র-সমবায়ের সংবিধানের এই অসুবিধাগুলি দূর করা জন্য হ্যামিলটনের উদ্যোগে ১৭৮৭ সালে কংগ্রেসের কাছে রাষ্ট্র-সমবায়ের চুক্তি সংশোধনের জন্য আবেদন জানান হয়। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়ায় ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে সমবায়ী রাষ্ট্রগুলির একটি কনভেনশন ডাকা হয়। এই কনভেশনে নতুন সংবিধান প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। ১৭৮৯ এর মার্চ মাসে নতুন সংবিধান প্রবর্তিত হয়। ১৩টি অঙ্গরাজ্যই এই নতুন সংবিধান অনুমোদন করে। ওয়াশিংটন রাষ্ট্রপতি হিসাবে ৩০শে এপ্রিল কার্যভার গ্রহণ করেন। প্রথমে ১৩টি রাজ্য থাকলেও পরে রাজ্যের সংখ্যা বেড়ে ৫০ হয়। এই সংবিধান অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবনা ও ৭টি অনুচ্ছেদ নিয়ে সংবিধানের শুরু হয়েছিল। পরে কিছু সংশোধনের সংযুক্তি ঘটেছে। তাছাড়াও কিন্তু শাসনতান্ত্রিক প্রথা ও রীতিনীতি, কংগ্রেস প্রণীত আইন ও সুপ্রীম কোর্টের রায়ের মাধ্যমে সংবিধানটি সম্প্রসারিত ও বিকশিত হয়েছে।

১০১.৩ সংবিধানের সম্প্রসারণ বা বিকাশ

একটি দেশের সংবিধান একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক স্তরে সেই দেশের অর্থনৈতিক দিক থেকে প্রভুত্বকারী শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার জন্য প্রণীত হয়। প্রতিটি দেশের সমাজ পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তাদের সংবিধানেরও পরিবর্তন করা হয়। সংবিধান পরিবর্তনের জন্য আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি ছাড়াও অন্যান্য উপায়ের সাহায্য নেওয়া হয়। এইভাবে পরিবর্তন দ্বারা সংবিধানের সম্প্রসারণ বা বিকাশ ঘটে।

১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে রচিত সংবিধানটি ক্ষুদ্র ছিল। তাতে একটি প্রস্তাবনা ও সাতটি অনুচ্ছেদ ছিল। গত ২০০ বছরেরও বেশি সময়ের মধ্যে মূল সংবিধানটি নানাভাবে পরিবর্তিত ও সম্প্রসারিত হয়েছে। লর্ড ব্রাইসের মতে, জাতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানও পরিবর্তিত হয়েছে। মুনরো বলেছেন যে ১৭৮৭ সালের সংবিধানের স্থপতিরা কেবলমাত্র সংবিধানের ভিত্তি স্থাপন করেছিলেন। উত্তরসুরিরা এটিকে সুসংহত কাঠামো হিসেবে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছেন। এই কাঠামো নির্মাণের কাজ এখনও শেষ হয় নি। মার্কিন সংবিধান নিশ্চল নয়, গতিশীল; তা নিউটনবাদী নয়, ডারউইনবাদী।

যে উপায়গুলির সাহায্যে মার্টিন সংবিধান সম্প্রসারিত হয়েছে, সেগুলি হল ঃ

(১) **সংবিধানের সংশোধন ঃ** সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মার্কিন সংবিধানের পরিধি বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রবর্তিত হওয়ায় অল্পদিন পরেই সংবিধানের দশটি সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। মূল সংবিধানে নাগরিক অধিকারসমূহের কোন স্বীকৃতি ছিল না। প্রথম দশটি সংশোধনী প্রস্তাব অনুসারে মার্কিন নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ সংবিধানের অন্তর্গত হয়। উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চলের গৃহযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সংবিধানে ত্রয়োদশ, চতুর্দশ ও পঞ্চদশ সংশোধন যুক্ত হয়। মূল সংবিধানকে যুগোপযোগী করে গড়ে তোলার জন্য সংবিধান সংশোধনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। তবে জটিল সংশোধন পদ্ধতির জন্য মার্কিন সংবিধান এ পর্যন্ত মাত্র ২৬ বার সংশোধিত হয়েছে।

(২) **কংগ্রেস প্রণীত আইন ঃ** বিভিন্ন সময়ে কংগ্রেস প্রণীত বিভিন্ন রকম আইনের সাহায্যে মার্কিন সংবিধানের সম্প্রসারণ হয়েছে। সংবিধানের ২ নং ধারায় প্রশাসনিক বিভাগগুলির উল্লেখ থাকলেও সেগুলি সম্বন্ধে সংবিধানে বিস্তৃত আলোচনা ছিল না। বিভিন্ন সময়ে আইন প্রণয়নের মাধ্যমে কংগ্রেস প্রশাসনিক বিভাগগুলির গঠন, কাঠামো ও ক্ষমতা সংক্রান্ত নানা আইন সৃষ্টি করেছে। মূল সংবিধানে সুপ্রীম কোর্ট গঠনের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু তার গঠন, বিচারপতিদের নিয়োগ, তাদের কার্যকাল ইত্যাদি বিষয়ে কোন কথা বলা হয় নি। অধস্তন আদালতগুলির সংখ্যা, গঠন ইত্যাদি সম্পর্কেও মূল সংবিধানে কিছু বলা হয়নি।

কংগ্রেস নানা সময়ে বিভিন্ন আইনের মাধ্যমে এই বিষয়গুলি স্থির করেছে। কংগ্রেস প্রণীত আইন দ্বারা প্রতিরক্ষা, সামরিক, কূটনৈতিক বিষয় ও বৈদেশিক সম্পর্কও নির্ধারিত হয়। ফিলাডেলফিয়ার ১৭৮৭ সালের দলিল সরকারের সাধারণ কাঠামো ও কার্যাবলী সম্পর্কে বিধিবিধানের উল্লেখ করেছিল। সংবিধান রচয়িতারা কংগ্রেসের হাতে কিছু বিষয় প্রদান করেন। ফলে মার্কিন সংবিধানের সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে কংগ্রেস প্রণীত আইনের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।

(৩) **বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত ঃ** মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের বিভিন্ন ধারার প্রয়োজনমত ব্যাখ্যা ও বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার (Judicial review) ক্ষমতা ভোগ করে এবং এই ক্ষমতা প্রয়োগ

করে সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেসের কোন আইন বা শাসনবিভাগীয় কোন সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিতে পারে। বিভিন্ন সময়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য সংবিধানের প্রায় প্রতিটি ধারাকে সুপ্রীম কোর্টের কাছে আনা হয়েছে এবং সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের বিভিন্ন ধারা ও উপধারার ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানের সম্প্রসারণ ঘটিয়েছে। সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্টের ভূমিকার গুরুত্ব প্রসঙ্গে বিচারপতি হিউজেস বলেছেন, "আমরা সংবিধানের অধীনে বাস করি, কিন্তু বিচারপতিরা যা বলেন তাই হোল সংবিধান।" সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছে। এ ক্ষেত্রে সুপ্রীম কোর্ট 'অনুমিত ক্ষমতা'র (implied powers) আশ্রয় নেয়। সংবিধানে বলা আছে যে সুস্পষ্টভাবে উল্লিখিত ক্ষমতা যথাযথ ও সার্থকভাবে প্রয়োগের প্রয়োজনে জাতীয় সরকার যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে। সুপ্রীম কোর্টের সমর্থনে জাতীয় বা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার এই অনুমিত ক্ষমতার অধিকারী হয়েছে। অনুমিত ক্ষমতাবলে সুপ্রীম কোর্ট কংগ্রেসের হাতে ও রাষ্ট্রপতির হাতে অনেক ক্ষমতা অর্পন করেছে।

(৪) **শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা ঃ** দেশের প্রশাসনিক প্রয়োজনে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি বা প্রথার সৃষ্টি হয়। এগুলিকে অলিখিত আইন বলা হয়। শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথা সংবিধানকে গাতিশীল ও সম্প্রসারণশীল চরিত্রদান করে। আমেরিকার সংবিধান লিখিত হলেও অনেক শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি ও প্রথার মাধ্যমে তা অলিখিতভাবে সম্প্রসারিত হয়েছে। মূল মার্কিন সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট বলে কিছু ছিল না। প্রথম রাষ্ট্রপতি ওয়াশিংটন প্রবর্তিত প্রথা অনুসারে রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেটের উদ্ভব হয়েছে। বর্তমান ক্যাবিনেট ব্যবস্থা মার্কিন শাসনব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মার্কিন সংবিধানে রাজনৈতিক দলের কোনও উল্লেখ ছিল না। কিন্তু প্রথার ভিত্তিতে সেখানে দলব্যবস্থা দেখা দিয়েছে। রাজনৈতিক দলগুলি মার্কিন শাসনব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। দলব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে আইন ও শাসনবিভাগের কাজের মধ্যে সমন্বয়সাধন অনেক সহজ হয়েছে। দলব্যবস্থার জন্যই রাষ্ট্রপতির পরোক্ষ নির্বাচন প্রত্যক্ষ নির্বাচনে পরিণত হয়েছে।

(৫) **শাসনবিভাগের ভূমিকা ঃ** শাসনবিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মার্কিন রাষ্ট্রপতি এমন অনেক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যার ফলে নানা সংবিধানিক সমস্যার সমাধান হয়েছে। তাঁরা সংবিধান ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যুক্ত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ওয়াশিংটন, জ্যাকসন, লিঙ্কন, রুজভেল্ট ইত্যাদি বিচক্ষণ রাষ্ট্রপতিদের নাম করা যায়। ওয়াশিংটন কাজের সুবিধার জন্য যে ক্যাবিনেট ব্যবস্থার প্রবর্তন করেন তা বর্তমানে শাসনতান্ত্রিক প্রথায় পরিণত হয়েছে। সংবিধান কংগ্রেসের হাতে যুদ্ধ ঘোষণার ক্ষমতা প্রদান করলেও বহু ক্ষেত্রে রাষ্ট্রপতিরা কংগ্রেসের নির্দেশের অপেক্ষা না করেই বিভিন্ন স্থানে সেনাবাহিনী প্রেরণ করেছেন।

বস্তুতপক্ষে দুষ্পরিবর্তনীয় হলেও এবং গত দুশ বছরের বেশি সময়ে মাত্র ২৬ বার সংশোধিত হলেও মার্কিন সংবিধান পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সঙ্গাতিবিধান করতে পেরেছে।

১০১.৪ সংবিধানের বৈশিষ্ট্যসমূহ

১৭৮৭ সালে গৃহীত ফিলাডেলফিয়া কনভেনশনে গৃহীত মার্কিন সংবিধান খুবই সংক্ষিপ্ত — মুদ্রিত দশ পাতার বেশি নয়। এই লিখিত ক্ষুদ্র সংবিধানটি পরবর্তীকালে প্রথা, রীতিনীতি, বিচারবিভাগীয় সিদ্ধান্ত, আইনসভা প্রণীত আইন ইত্যাদির দ্বারা সম্প্রসারিত হয়েছে। এ সম্পর্কে আগেই বলা হয়েছে। মার্কিন সংবিধানের এই সাধারণ চরিত্র স্মরণ রেখে আমরা এবার তার বৈশিষ্ট্যগুলির ওপর আলোচনাও করব।

(১) **জনগণের সার্বভৌমত্ব ঃ** সংবিধানের প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে "আমরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ অধিকতর সার্থক এক রাজ্যসংঘ গঠন, ন্যায়প্রতিষ্ঠা, আভ্যন্তরীণ শান্তিশৃঙ্খলা সুনিশ্চিতকরণ যৌথ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা স্থাপন, জনগণের কল্যাণবৃদ্ধি এবং আমাদের ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য স্বাধীনতা সম্ভব করার উদ্দেশ্যে যুক্তরাষ্ট্রের এই সংবিধান বিধিবদ্ধ ও প্রতিষ্ঠা করলাম। (We, the people of United States, in order to form a more perfect union, establish justice, insure domestic tranquility, provide for the common defence, promote the general welfare and secure the blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain and establish the constitution for the United States.) সংবিধানের প্রস্তাবনা সুস্পষ্টভাবে জনগণের সার্বভৌমত্ব ঘোষণা করেছে। সংবিধানের অধীনে প্রতিষ্ঠিত শাসনব্যবস্থার ভিত্তি হল জনসম্মতি, যা গণতন্ত্রের মূল স্তম্ভ।

(২) **লিখিত শাসনতন্ত্র ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানকে পৃথিবীর সর্বপ্রথম লিখিত সংবিধান বলা যায়। শাসনতান্ত্রিক বিধি ও আইন এখানে একটি নির্দিষ্ট দলিলে লিখিতভাবে সন্নিবিষ্ট আছে। ব্রিটেনের মত আমেরিকার সংবিধান অলিখিত নয়। পরবর্তীকালে আমরা ভারতবর্ষ, পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়ন, সুইজারল্যাণ্ড ইত্যাদি দেশেও লিখিত সংবিধান পেয়েছি। আমেরিকার সংবিধান একদিকে কেন্দ্রীয় ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করেছে, অন্যদিকে সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ দ্বারা প্রত্যেক বিভাগের ক্ষমতা প্রয়োগের এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। তবে বিগত ২১২ বছরের বিবর্তনের মাধ্যমে অনেক অলিখিত অংশ সাংবিধানিক মর্যাদালাভ করেছে। এ প্রসঙ্গে ক্যাবিনেট ব্যবস্থা, রাজনৈতিক দলের উদ্ভব ও প্রভাব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। সংবিধান প্রণেতারা আমেরিকার সংবিধানের মৌলিক নীতিগুলিই নির্দেশ করেছিলেন। কালের বিবর্তনে সেই মৌলিক নীতিগুলির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই কিছু অলিখিত অংশ সংবিধানগতভাবে গুরুত্ব লাভ করেছে।

(৩) **দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান ঃ** আনুষ্ঠানিক সংবিধান সংশোধন পদ্ধতির দিক থেকে মার্কিন সংবিধান খুবই দুষ্পরিবর্তনীয়। এটি সংশোধন করতে গেলে দুটি পর্যায় দেখা যায় — (১) সংশোধনী প্রস্তাব কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই তৃতীয়াংশের সংখ্যা গরিষ্ঠতা বা দুই তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহুত এক সভায় গ্রহণ করতে হবে। (২) ঐ প্রস্তাব আবার অঙ্গ

রাজ্যগুলিতে ঐ উদ্দেশ্যে আহুত সভার অন্ততঃ তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা বা আইনসভাগুলির তিন-চতুর্থাংশ দ্বারা সমর্থিত হওয়া প্রয়োজন। সংশোধনী প্রস্তাব এভাবে গৃহীত ও সমর্থিত হলে তবেই আমেরিকার সংবিধানের সংশোধন সম্ভব। সংশোধন পদ্ধতির এই জটিলতার ও দুঃসাধ্যতার জন্য আমেরিকার সংবিধানকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলা হয়। আমেরিকার সংবিধান জটিল সংশোধন পদ্ধতির জন্য গত ২১২ বছরে মাত্র ২৬ বার সংশোধিত হয়েছে।

বাস্তবে দুষ্পপরিবর্তনীয় হলেও কার্যত আমেরিকার সংবিধানের রূপ সুপরিবর্তনীয়। সুপ্রীম কোর্ট সংবিধানের বিচারবিভাগীয় ব্যাখ্যার মাধ্যমে সংবিধানকে সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সামঞ্জস্য প্রদান করেছে এবং সংবিধানকে পরিবর্তনশীল চরিত্রদান করেছে। সংবিধানের অনুমিত ক্ষমতার ভিত্তিতে বিভিন্ন সংকটে/ রাষ্ট্রপতিরা জাতির উপযুক্ত নেতৃত্বপ্রদান করেছেন এবং সংবিধানকেও গতিশীল হতে সাহায্য করেছেন। অলিখিত রীতিনীতি ও প্রথা দ্বারা সংবিধান পরিবর্তিত হয়েছে। তাই মুনরোর মতে, আমেরিকার সংবিধান স্থিতিশীল নয় — গতিশীল, নিউটোনিয়ান নয়, ডারউইনিয়ান। অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন যে বাস্তবে আমেরিকার সংবিধান ব্রিটেনের সংবিধানের থেকেও সুপরিবর্তনীয়।

(৪) **ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ঃ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণকে অষ্টাদশ শতকের রাজনৈতিক ধ্যানধারণার প্রতিফলন বলা যায়। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতিটিকে আমেরিকার সংবিধান রচয়িতারা দেখেন। ঔপনিবেশিক শাসনে শাসকের স্বৈরাচার ও ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণকে সংবিধান রচয়িতারা স্বাধীনতার প্রতিবন্ধক মনে করেছিলেন। তাই ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ও স্বৈরাচার থেকে মুক্তির জন্যই আমেরিকার সংবিধানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। শাসন, আইন ও বিচারবিভাগের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ যাতে না থাকে, সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। এজন্য আমেরিকার সংবিধানে আইন, শাসন ও বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার সুস্পষ্ট উল্লেখ দেখা যায়। মার্কিন সংবিধানের ১,২,৩ অনুচ্ছেদ অনুসারে যথাক্রমে কংগ্রেস আইনবিভাগীয়, রাষ্ট্রপতি শাসনবিভাগীয় এবং সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রপতি বা তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যরা কেউই কংগ্রেসের সদস্য নন। কংগ্রেসে তাঁরা আইন প্রণয়নের উদ্যোগ নিতে পারেন না, কংগ্রেসের কাছে তাঁদের কোন দায়িত্বশীলতাও নেই। বিচারবিভাগও আমেরিকায় আইন ও শাসনবিভাগের এক্তিয়ায় থেকে মুক্ত ও স্বাধীন।

(৫) **নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতি ঃ** ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের ফলে যাতে কোন একটি বিভাগ স্বেচ্ছাচারীভাবে ক্ষমতার প্রয়োগ করতে না পারে, সেজন্য মার্কিন সংবিধানে প্রত্যেক বিভাগকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা অপর দুই বিভাগকে দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন বিভাগের পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই শাসন যন্ত্রে ভারসাম্য রক্ষিত হয়। আমেরিকার সংবিধান তাই ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের নীতিটিকে ও গুরুত্বপ্রদান করেছে। কোন বিভাগই অনন্য ক্ষমতা ভোগ করে না। কংগ্রেসের হাতে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা ন্যস্ত থাকলেও রাষ্ট্রপতি সেই আইনে 'ভিটো' প্রয়োগ বা অসম্মতি

জানাতে পারেন। রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনবিভাগীয় ক্ষমতা ন্যস্ত। কিন্তু সন্ধিচুক্তি সম্পাদন, গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ বা কোন দেশের সঙ্গে যুদ্ধ ও শান্তি ঘোষণার ক্ষেত্রে সিনেট সভার দুই-তৃতীয়াংশের অনুমোদন প্রয়োজন। মার্কিন সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের বিচার সংক্রান্ত চরম ক্ষমতা থাকলেও কংগ্রেস তাদের ইম্‌পীচমেন্ট পদ্ধতি দ্বারা পদচ্যুত করতে পারে। সুপ্রীম কোর্ট আবার কংগ্রেস প্রণীত আইন ও রাষ্ট্রপতির কাজকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের ব্যাখ্যা নিয়ে কোন মতবিরোধ দেখা দিলে সুপ্রীম কোর্ট তার মীমাংসার অধিকারী। সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিদের আবার সেনেটের অনুমোদন সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি নিয়োগ করে থাকেন। এইভাবে সংবিধান অনুযায়ী প্রত্যেক বিভাগ সরকারের তিনটি শাখা একে অন্যের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে।

(৬) **মৌলিক অধিকার ঃ** মূল মার্কিন সংবিধানে মৌলিক অধিকার ছিল না। পরে প্রথম দশটি সংশোধনের মাধ্যমে মার্কিন সংবিধান মৌলিক অধিকারকে সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করেছে, যেমন, ধর্মাচরণের স্বাধীনতা, বাক স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, আইনের দৃষ্টিতে সাম্য ইত্যাদি। এই দশটি সংশোধনকে মার্কিন নাগরিকদের 'অধিকারের সনদ' বলা হয়।

(৭) **রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসন ঃ** সংবিধান অনুসারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। জনগণের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতির হাতে শাসনবিভাগের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতির একক কর্তৃত্ব শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ব্রিটেনের মত শাসনবিভাগের দায়িত্ব যৌথভাবে ক্যাবিনেটের ওপর ন্যস্ত নয়। রাষ্ট্রপতিকে সাহায্য ও পরামর্শদান করার জন্য একটি ক্যাবিনেট আছে। কিন্তু রাষ্ট্রপতি তাঁর ক্যাবিনেটের পরামর্শমত কাজ করতে বাধ্য নন। বস্তুত, ক্যাবিনেট সদস্যদের রাষ্ট্রপতি নিজেই ইচ্ছামত নিয়োগ করেন এবং যখন খুশী তাদের পদচ্যুত করতে পারেন। ক্যাবিনেটকে রাষ্ট্রপতির ভৃত্যের মত মনে করা যায়। ক্যাবিনেটের কংগ্রেসের কাছে কোন দায়িত্বশীলতা নেই, ক্যাবিনেটের কোন সাংবিধানিক মর্যাদাও নেই।

(৮) **বিচারবিভাগের প্রাধান্য ঃ** বিচারপতি হিউসের-এর (Hughes) মতে, "We are under the Constitution, and the Constitution is what the judges say it is." ("আমরা সংবিধানের অধীন, এবং সংবিধান হল বিচারপতিগণ যে ব্যাখ্যা দেন, তাই।" মার্কিন সুপ্রীম কোর্ট বিচারবিভাগীয় সমীক্ষার ক্ষমতাবলে শাসনবিভাগের কোন কাজ বা আইনবিভাগ রচিত কোন আইন সংবিধান বিরোধী মনে করলে সেই কাজ বা আইনকে অবৈধ ঘোষণা করতে পারে। সংবিধানের শুরু থেকেই সুপ্রীম কোর্ট এই ক্ষমতা প্রয়োগ করে আসছে। তাছাড়াও যে কোন কাজ বা আইনকে বিচার করার সময় সুপ্রীম কোর্ট তার পদ্ধতিগত ও বস্তুগত উভয় দিকের বিচার করে। বস্তুগত বা নৈতিক দিকের বিচারের ফলে সুপ্রীম কোর্ট প্রভূত ক্ষমতাশালী হয়ে উঠেছে। এজন্য মার্কিন সুপ্রীম কোর্টকে পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী বিচারালয় বলা হয়। ব্রিটেনে পার্লামেন্টের আইনকে অবৈধ বলার ক্ষমতা আদালতের নেই। তাই সেখানে পার্লামন্টের প্রাধান্য দেখা যায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রীম কোর্ট যে কোন আইন বা শাসনবিভাগীয় কাজকে অবৈধ বলার ক্ষমতাযুক্ত হওয়ায় সেখানে বিচারবিভাগের প্রাধান্য লক্ষণীয়।

(৯) **যুক্তরাষ্ট্রীয় প্রকৃতি ঃ** যুক্তরাষ্ট্র বলতে বোঝায় লিখিত সংবিধান দ্বারা কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে ক্ষমতাবন্টন, সংবিধানের প্রাধান্য ও নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালতের উপস্থিতি। মার্কিন সংবিধানে তিনটি বৈশিষ্ট্যই লক্ষ্য করা যায়। স্ট্রং-এর (Strong) মতে, "The constitution of the United States is the most completely federal constitution in the world." ("মার্কিন সংবিধান হল পৃথিবীর সবথেকে বেশি বা সম্পূর্ণ যুক্তরাষ্ট্রীয় সংবিধান।") মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে লিখিত সংবিধানের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়েছে; সংবিধানের ৬ ধারায় বলা হয়েছে যে মার্কিন সংবিধানই দেশের চরম ও প্রধান আইন। সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টিত হয়েছে। কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যের মধ্যে বিবাদ বা অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে বিবাদ মীমাংসা বা সংবিধান ব্যাখ্যার চরম ক্ষমতা সুপ্রীম কোর্টকে দেওয়া হয়েছে। সুপ্রীম কোর্ট হল নিরপেক্ষ যুক্তরাষ্ট্রীয় আদালত।

(১০) **দ্বৈত নাগরিকতা ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকতা একদিকে কেন্দ্র বা যুক্তরাষ্ট্রের এবং অন্যদিকে রাজ্যের নাগরিক। এই দুই ধরনের নাগরিকতার মধ্যে কোন বিরোধ নেই।

(১১) **রাজ্যগুলির স্বতন্ত্র/সংবিধান ঃ** মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে শুধুমাত্র কেন্দ্রীয় সরকার সম্বন্ধেই ব্যবস্থা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংবিধান শুধুমাত্র কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারগুলির মধ্যে ক্ষমতা ভাগ করে দিয়েছে। কেন্দ্রের ক্ষমতা নির্দিষ্ট করে অবশিষ্ট ক্ষমতা রাজ্যগুলিকে দিয়েছে। রাজ্যের সরকার কীভাবে চলবে তা রাজ্যের সংবিধান দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। প্রত্যেক রাজ্যের নিজস্ব সংবিধান আছে।

(১২) **অঙ্গরাজ্যগুলির সমতা ঃ** মার্কিন সংবিধানে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সব ধরনের অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে সমতার অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আয়তন নির্বিশেষে প্রতিটি অঙ্গরাজ্য কেন্দ্রীয় আইনসভার উচ্চকক্ষ সিনেটে দুজন প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে।

(১৩) **দ্বিকক্ষবিশিষ্ট আইনসভা ঃ** মার্কিন আইনসভা বা কংগ্রেস দ্বিকক্ষবিশিষ্ট। নিম্নকক্ষ বা জনপ্রতিনিধি সভায় জনসংখ্যার ভিত্তিতে এবং উচ্চকক্ষ বা সিনেটে সব রাজ্যের সমপ্রতিনিধিত্ব নীতি স্বীকৃত হয়েছে। প্রতিটি রাজ্য থেকে দুজন প্রতিনিধি সিনেটে প্রেরিত হয়।

(১৪) **প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনব্যবস্থা ঃ** মার্কিন শাসনব্যবস্থায় আইন প্রণয়ন করে জনগনের দ্বারা নির্বাচিত কংগ্রেস (কেন্দ্রীয় স্তরে) এবং বিভিন্ন রাজ্যের আইনসভাগুলি (রাজ্যস্তরে)। শাসনবিভাগের প্রধান রাষ্ট্রপতি (কেন্দ্রীয় স্তরে) এবং রাজ্যপাল (রাজ্যস্তরে) নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হন।

(১৫) সীমাবদ্ধ শাসনব্যবস্থা ঃ সরকার যাতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠতে না পারে সেজন্য মার্কিন সংবিধান সরকারী ক্ষমতার ওপর কতকগুলি বাধানিষেধ স্থাপন করেছে। যেমন, সরকার ব্যক্তির অধিকার হরণ করতে পারবে না। কিছু বিষয়ের ওপর কেন্দ্রীয় সরকার এবং কিছু বিষয়ের ওপর রাজ্য সরকারের ক্ষমতা আছে। আইনশাসন ও বিচারবিভাগ পরস্পরকে নিয়ন্ত্রণ দ্বারা ভারসাম্য রক্ষা করে,

কেউই অপরের সম্মতি ছাড়া কাজ করতে পারে না। আবার একমত হয়ে তারা কাজ করলেও সুপ্রীম কোর্ট তা বাতিল করে দিতে পারে।

১০১.৫ সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতি

সামাজিক দলিল হিসাবে সংবিধান একটি নির্দিষ্ট সময়ে সামাজিক সমস্যার সমাধান ও সমাজের সামগ্রিক উন্নতিবিধানের জন্য রচিত হয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সমাজব্যবস্থা ও তার সমস্যাদির চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটে। তাই সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনের তাগিদে সংবিধানেরও প্রয়োজনীয় সংশোধন করতে হয়। অন্যান্য দেশের মত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানেও সংবিধান সংশোধন পদ্ধতি আলোচিত হয়েছে।

সংবিধানের ৫ নং ধারায় সংবিধানের সংশোধন পদ্ধতিটি বর্ণিত হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণ আইনপাশের পদ্ধতিতে সংবিধান সংশোধন করা যায় না। এজন্য বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করা প্রয়োজন। সংবিধানে সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব উত্থাপনের দুটি পদ্ধতি এবং প্রস্তাবটি অনুমোদনের দুটি পদ্ধতির কথা বলা হয়েছে।

সংবিধান সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপনের দুটি পদ্ধতি হল ঃ

(i) কংগ্রেসের উভয় কক্ষের দুই-তৃতীয়াংশের সংখ্যাগরিষ্ঠতার সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে। *অথবা*

(ii) দুই-তৃতীয়াংশ অঙ্গরাজ্যের আইনসভাসমূহের অনুরোধক্রমে আহুত একটি কনভেনশন বা সভায় সংবিধান সংশোধনের প্রস্তাব উত্থাপিত হতে পারে।

সংবিধান সংশোধন প্রস্তাব অনুমোদনের দুটি পদ্ধতি হল ঃ

(i) অঙ্গরাজ্যগুলির আইনসভাগুলির তিন চতুর্থাংশ দ্বারা অনুমোদিত হলে সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হয়। *অথবা*

(ii) সংবিধান সংশোধনের উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ্যগুলির আহুত কনভেনশনের তিন চতুর্থাংশ কর্তৃক অনুমোদিত হলে তবেই তা গৃহীত হতে পারে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান সংশোধন পদ্ধতিটির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন ঃ

(১) সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে রাজ্যগুলির ভূমিকা বিশেষভাবে স্বীকৃতিলাভ করেছে। সংবিধান সংশোধনের যে কোন প্রস্তাব উত্থাপনের ক্ষমতা যেমন তাদের আছে, তেমনি তিন-চতুর্থাংশ অঙ্গরাজ্যের সম্মতি ছাড়া কোন সংশোধনী প্রস্তাব গৃহীত হতে পারে না। মার্কিন সংবিধান সংশোধনের ক্ষেত্রে কেন্দ্রের একক প্রাধান্যের বদলে তাই কেন্দ্র ও অঙ্গরাজ্যগুলির যৌথ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।